কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর—৮২

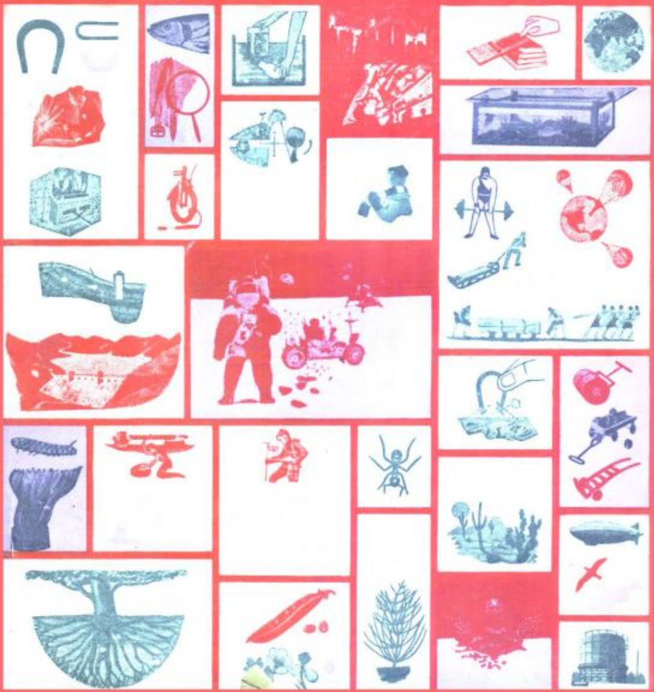

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

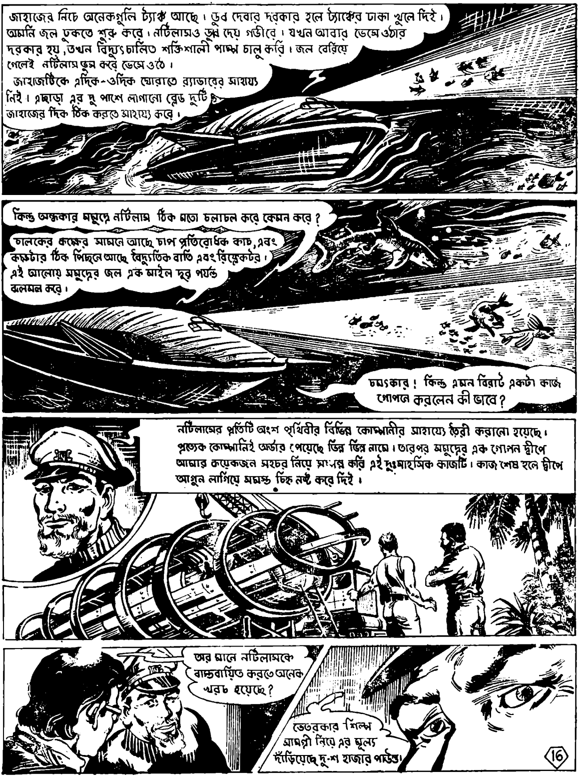
জাহাজের নিচে অনেকগুলি ট্যাঙ্ক আছে। ডুব দেবার দরকার হলে ট্যাঙ্কের ঢাকা খুলে দিই। অমনি জল ঢুকতে শুরু করে। নটিলাসও ডুব দেয় গভীরে। যখন আবার ভেসে ওঠার দরকার হয়, তখন বিদ্যুৎচালিত শক্তিশালী পাম্প চালু করি। জল বেরিয়ে গেলেই নটিলাস ভুস করে ভেসে ওঠে।
জাহাজটিকে এদিক-ওদিক ঘোরাতে র‍্যাডারের সাহায্য নিই। এছাড়া এর দু পাশে লাগানো ব্লেড দুটি জাহাজের দিক ঠিক করতে সাহায্য করে।
কিন্তু অন্ধকার সমুদ্রে নটিলাস ঠিক মতো চলাচল করে কেমন করে?
চালকের কক্ষের সামনে আছে চাপ প্রতিরোধক কাচ, এবং কক্ষটার ঠিক পিছনে আছে বৈদ্যুতিক বাতি এবং রিফ্লেকটর। এই আলোয় সমুদ্রের জল এক মাইল দূর পর্যন্ত ঝলমল করে।
চমৎকার! কিন্তু এমন বিরাট একটা কাজ গোপনে করলেন কী ভাবে?
নটিলাসের প্রতিটি অংশ পৃথিবীর বিভিন্ন কোম্পানীর সাহায্যে তৈরী করানো হয়েছে। প্রত্যেক কোম্পানিই অর্ডার পেয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নামে। তারপর সমুদ্রের এক গোপন দ্বীপে আমার কয়েকজন সহচর নিয়ে সম্পন্ন করি এই দুঃসাহসিক কাজটি। কাজ শেষ হলে দ্বীপে আগুন লাগিয়ে সমস্ত চিহ্ন নষ্ট করে দিই।
অর মানে নটিলাসকে বাস্তবায়িত করতে অনেক খরচ হয়েছে?
ভেতরকার শিল্প সামগ্রী নিয়ে এর মূল্য দাঁড়িয়েছে দু-শ হাজার পাউন্ড।
16

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ॥ সেপ্টেম্বর ॥ ১৯৮২
প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন তোমাদের হাতে গিয়ে পৌঁছবে—তখন আমাদের দপ্তরে পুজো সংখ্যার তোড় জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। এবারের পুজো সংখ্যা গতবারের চেয়েও আরও আকর্ষণীয় হচ্ছে। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া প্রভৃতির সঙ্গে থাকবে ৪টি সুদীর্ঘ রঙ্গীন চিত্র কাহিনী। তবে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল—এক প্যাকেট ম্যাজিক কার্ড—যা হাতে পেলেই তোমরা খেলার আনন্দে মেতে উঠবে।

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদকীয় : ১
চিঠিপত্র : ২

দপ্তর থেকে
উটের মেঘ : সমরজিৎ কর ৩

উপন্যাস
অল ইণ্ডিয়া কমন পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড : ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ৯

আবিষ্কারের গল্প
প্রাণীদেহের স্বাভাবিক পুনর্গঠন : সুধাংশু পাত্র ২৫

পড়াশোনা
ঘড়ির অঙ্ক : অসীম মুখোপাধ্যায় ২৬
জৈব রসায়নের বিক্রিয়া : অমরনাথ রায় ৩৩
লেনস : অলক চক্রবর্তী ৪৩
জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ : তারকমোহন দাস ৪১

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার : রেখা দাঁ ১২
সংবাদ—৫

পশুপাখীর পরিচয়
মাছরাঙা পাখিদের কথা : অজয় হোম ৬
ঢাল : প্রদীপ বসু ১৪
ডলফিনের হাসি : ধীরেন দত্ত ৩৭

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
কিউবের রাজা : অনীশ দেব ৪৭
পৃথিবীর কি গ্রহণ হয় ? : বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ৪৫
কলকাতার যাদুঘরে মিশরের মমি : উৎপল হোমরায় ১৬
আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী চাঁদ : বিমান বসু ১৭
রাতের আকাশ কালো কেন ? : কৃষ্ণা দে ৩৯
কু-ই-জ : রমেন রায় ২৩
ভাবনা : অনির্বাণ চক্রবর্তী ৩০

নিজেকর
ফায়ার অ্যালার্ম : আশীষকুমার রায় ৩১

ছবিতে গল্প
বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র : দিলীপ দাস ৮
খুদে বৈজ্ঞানিক : দিলীপ দাস ১২, ১৫
ছবির মজা : প্রণব হোড় ২৬
হাবুলের বিজ্ঞানভাবনা : ধীরেন বল ৫৬
টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী : গৌতম সরকার : প্রচ্ছদ : ২, ৩

ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম ৫৩
শব্দকূটের সমাধান : ৫৪ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা : ৫৪
শব্দসন্ধান : অনুরাধা রায় ৫৫

চিঠিপত্র

॥ প্রসঙ্গ ঃ নেপচুন এর আবিষ্কর্তা ॥

জুলাই ৮২ সংখ্যার কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিপ্লব মোহান্ত ও অন্যান্যদের পত্রের উত্তরে জানাই যে The Encyclopaedia Britannica গ্রন্থের চতুর্দশ সংস্করণের 226 থেকে 228 পৃষ্ঠার মধ্যে 'নেপচুন' আবিষ্কারের কাহিনী সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। 227 পৃষ্ঠার এক জায়গায় লেখা আছে "The question whether leverrier should receive the sole cerdit of the discovery was warmly discussed." কিন্তু তারপরে ঐ গ্রন্থের কোথাও চূড়ান্তভাবে এ কথা নেই যে Leverrier-ই নেপচুন এর আবিষ্কর্তা। প্রকৃতপক্ষে নেপচুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে Adams এবং Leverrier, উভয়েরই যথেষ্ট অবদান আছে। এ ক্ষেত্রে আমার উত্তরটা যে ভুল বা পত্রদাতাদের উত্তরটা যে ঠিক তার প্রমাণ পাচ্ছি না। যদি পত্রদাতাদের কাছে এমন কোন নির্ভরযোগ্য Reference বই থাকে যাতে Leverrier কে নেপচুন এর আবিষ্কর্তা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তবে তা আমাকে জানালে সুখী হব।—

অমরনাথ রায়, খড়্গপুর মেদিনীপুর।

সম্পাদক, কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

মহাশয়গত এপ্রিল ১৯৮২ সংখ্যার "কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে" প্রকাশিত অনীশ দেবের "সূর্য কতো দিন বাঁচবে ?" রচনাটি পড়লাম। তিনি ৬ পৃষ্ঠার ১ম কলমের ১৪ লাইনে লিখেছেন, "বিক্রিয়ার ফলে সামান্য একটু ভর (MASS) কমে গিয়ে তৈরী হয় সামান্য একটু শক্তি (ENERGY)। কিন্তু আইনস্টাইনের সূত্র অনুসারে বিক্রিয়ার ফলে সামান্য একটু ভর (MASS) কমে গিয়ে তৈরী হয় বিপুল শক্তি (ENERGY), পরবর্তী সংখ্যায় এই ত্রুটিটি সংশোধন করা হবে কি ?

পুষ্পেন্দু চৌধুরী, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন, ত্রিপুরা।

লেখকের উত্তর ঃ নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় ভরের পরিবর্তন খুব কম। তবে শক্তির উদ্ভব $E = mc^2$ সমীকরণ অনুযায়ীই। যেহেতু এই শক্তি সূর্যের মোট শক্তির তুলনায় অতি সামান্য তাই লেখায় 'সামান্য' শক্তি বলা হয়েছে।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, মে—'৮২ সংখ্যায় বিমান বসুর লেখা "সৌরজগৎ" (গ্রহ পরিচয়—১) পড়লাম। তিনি সৌরমণ্ডলে ন'টি গ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা জানি গ্রহের সংখ্যা দশ। এবং দশম গ্রহটির নাম 'ভলক্যান'। এইগ্রহ সম্বন্ধে যদি তিনি কিছু লেখেনতাহলে বাধিত থাকিব।

শ্রীমান মানসকুমার গোস্বামী, কাঁকুড়গাছি।

একজনে অনেকগুলো গাছ

মুখের ওপর একরাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে বাসটা চলে গেল। পোড়া ডিজেলের গন্ধে পেটের ভাত উঠে আসার জোগাড়। কলকাতার রাস্তায় এ আর নতুন কি অভিজ্ঞতা ?

এসব তো নিত্যকার ঘটনা তোমাদের জীবনেও। তবে পুরোনো হলেও দরকারী কথাটা তোমাদের আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া যাক। কলকাতার বাতাস আজ ভয়ঙ্কর রকম নোংরা বা দূষিত হয়ে হয়ে উঠেছে। বাস, মোটরের পোড়া মবিলের বিষাক্ত কালো ধোঁয়া, গেরস্থ বাড়ির উনুন, কল-কারখানার ধোঁয়া ইত্যাদি কলকাতার বাতাসকে করে তুলেছে নিঃশ্বাস নেওয়ার অযোগ্য। আর যত দিন যাচ্ছে, ততই এই দূষিত হাওয়া কলকাতার মানুষকে করে তুলেছে অসুস্থ। নানারকম শ্বাস-জনিত ও ফুসফুসের রোগ বাড়ছে।

তাই বলে হাওয়া বদলের জন্যে কলকাতাকে তো আর দেওঘর বা মধুপুরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তার বদলে মধুপুরের সাফ-সুতরা হাওয়া বইয়ে দিতে হবে কলকাতার বুকে। কি করে ? অনেক অনেক গাছ পুতে। গাছ যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে এটাও তোমাদের জানা খবর। তবে এবারে কিন্তু "প্রত্যেকে একটা করে" নয়, "একজনে অনেকগুলো" করে গাছ লাগাতে হবে। আর সারা বছর ধরে। কলকাতার মাটিতে সেটা সম্ভব যদি একটু যত্ন নেওয়া যায়।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ. ৩-এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

দপ্তর থেকে

উটের মেঘ

সমরজিৎ কর

৩০ নভেম্বর, ১৯৭৩। পূব আকাশে ফুটে উঠেছে প্রভাতী আলো। সূর্য তখনও দিগন্তের নীচে। এমন সময়, হ্যাঁ, দিগন্তের যে ফাঁকটুকু দিয়ে সূর্যোদয়ের কথা, ঠিক তার কাছাকাছি দেখা গেল ফোয়ারার মত মেঘ। ক্রমে সেই মেঘ স্পষ্ট হ'ল। আরো স্পষ্ট। কিন্তু সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর তাকে দেখা গেল না। ঘটনাটি এই ভাবেই চলতে লাগলো। দিনের পর দিন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বললেন, দেখে নিন, দেখে নিন। কারণ ৩০শে জানুয়ারী ১৯৭৩-এর পর পুচ্ছের মত ওই মেঘ আর কেউ দেখতে পাবেন না। আগামী ৭৫০০০ বছরে রমধ্যেও না।

আসলে ওটা ছিল ধূমকেতুর পুচ্ছ। নাম কহোতেক।

১৯৭৩ এর মার্চে প্রথম জানা গিয়েছিল এই ধূমকেতুটির কথা। এটি প্রথম আবিষ্কার করেন চেক্ জ্যোতির্বিজ্ঞানী লুব্‌স কহোতেক। তাঁর নামেই ধূমকেতুটির নামকরণ। একটি উপবৃত্তীয় পথ ধরে ঘণ্টায় ৭০০০০ মাইল বেগে তখন সূর্যের দিকে এগিয়ে আসছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল যেন ছোট্ট একটি আলোক পিণ্ড। কিন্তু সূর্যের কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোক পিণ্ড থেকে বেরিয়ে এল মেঘের মত দেখতে দীর্ঘ পুচ্ছ। মার্চ, ১৯৭৪ এর মাঝামাঝি ধূমকেতুটি আর দেখা যায় নি। আর তারপর প্রশ্ন উঠেছিল, কোথায় গেল এই ধূমকেতু? আগামী ৭৫০০০ বছরের মধ্যে কেন এই ধূমকেতুটি আর দেখা যাবে না?

তোমরা হয়তো জানো, গ্রহ উপগ্রহ, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতির মত ধূমকেতুও বাস করে আমাদেরই সৌরমণ্ডলে। সূর্য থেকে যখন তারা অনেক দূরে থাকে তখন তাদের দেখায় খুদে আলোক বিন্দুর মত। এই আলোক বিন্দুকে বলা হয় ধূমকেতুর 'মস্তক'। ইংরেজিতে বলা হয় কোমা।' ধূমকেতুর মস্তক সম্ভবতঃ ছোট ছোট বরফের কুচি দিয়ে তৈরি! তবে কিসের বরফ—জল, কার্বন ডাই অক্সাইড না আর কিছুর—বলা শক্ত। কেউ কেউ বলেন, এক এক ধূমকেতু এক এক ধরণের বস্তু দিয়ে তৈরি। কোণটি কী-কী সামগ্রী দিয়ে তৈরি। সেটা নির্ভর করে সেটি কোন সময়ে কী ভাবে তৈরি হয়েছিল তার ওপর!

পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধূমকেতু থেকে বিকীর্ণ আলো বিশ্লেষণ করে আবার এমনও বলেছেন কোন কোন জ্যোতি-র্বিজ্ঞানী—ধূমকেতুর মাথা কতকটা উল্কা পিণ্ডের মত। তার অভ্যন্তরে রয়েছে লোহা, নিকেল প্রভৃতি ভারী পদার্থ। পাথর কুচি ও ধূলিকণা। আর বাইরের অংশ বরফ। সেই বরফে জল এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়াও রয়েছে কার্বন সায়ানোজেন, অ্যামাইনস, কার্বন মনো-কসাইড. নাইট্রোজেন। সূর্য থেকে যখন বহুদূরে থাকে এই সব বস্তু সামগ্রী তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় থাকে জমাট অবস্থায়। সূর্যের কাছাকাছি এলে সূর্যের উত্তাপে তার বাইরের অংশের বস্তু সামগ্রী বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পী-ভূত অংশ ঈষৎ বেঁকে থাকে। ধূমকেতুকে তখন দেখায় 'কোমা'র (,) মত। অবশেষে যখন তা সূর্যের আরও কাছে সরে আসে সেই কমার বাঁকান অংশটা বাড়তে থাকে —ক্রমে দীর্ঘতর হয়। ঝাঁটার মত। যাকে বলা হয় পুচ্ছ। এই পুচ্ছ কখনও কখনও লক্ষ বা কোটি মাইলের মত দীর্ঘ হয়। মেঘের মধ্যেকার সামগ্রী ছড়িয়ে যায় মহাকাশে। তাই ধূমকেতু যতবার সূর্যের কাছাকাছি হয় তার বস্তু সামগ্রী হ্রাস পায়। সূর্য থেকে আবার যখন দূরে চলে যেতে থাকে তার পুচ্ছও তখন ক্রমে ছোট হয়। অবশেষে পরিণত হয় নিরেট গোলকে।

মজার ব্যাপার হলো, কোন কোন ধূমকেতুর সঞ্চারপথ উপবৃত্তীয়। কারোর বা অধিবৃত্তীয়। তাই কোন কোন ধূমকেতু সূর্যের কাছাকাছি থাকে এবং অল্পসময় পর পর সূর্যের নিকটবর্তী হয়। এই সময়—কখনও কখনও ৩·৩ বছরের মত হয়ে থাকে। আবার কারোর বা সময় লাগে ১০০০০০০ বছর। দ্বিতীয় শ্রেণীর এই ধূমকেতুগুলি তাদের সঞ্চারপথ দিয়ে চলতে চলতে সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে বহুদূর চলে যায়।

হয়ত জিজ্ঞেস করবে, তা হলে ধূমকেতুর সঠিক পরিচয় কী?

হ্যাঁ, এ প্রশ্নের উত্তর বহু বছর আগেই দিয়েছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। ১৭০৪ সালে মোট ২৪টি ধূমকেতুর উপর পর্যবেক্ষণ চালান তিনি। এই পর্যবেক্ষণের পর তিনি মন্তব্য করেন, গ্রহগুলির মত এক একটি ধূমকেতুরও নির্দিষ্ট চলার পথ থাকে। এক একটি গ্রহ যেমন নির্দিষ্ট সময়ে তার চলার পথ একবার করে শেষ করে, ধূমকেতুও তেমনটি করে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে ধূমকেতুর আচরণ গ্রহেরই মত। এর সঙ্গে আর

একটু জুড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছেন সূর্যের দূরবর্তী গ্রহ ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো যে ভাবে তৈরি হয়েছিল এক সময় ধূমকেতুও তৈরি হয়েছিল সেই ভাবে।

তা না হয় হলো। বহু ধূমকেতু আমাদের সৌর-মণ্ডলের মধ্যেই গ্রহগুলির মত বিচরণ করছে যেমন, ঠিক তেমনি যে সব ধূমকেতু সৌরমণ্ডলে বিচরণ করার পর সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে দূরে চলে যায়—তারা যায় কোথায়? সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করার পর কোন্ অজানা পথে পাড়ি দিয়েছে কহোতেক ধূমকেতু?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন, যাবে আর কোথায়? যাচ্ছে 'উর্ট' এর মেঘরাজ্যে। তাঁরা বলছেন, বিচিত্র এই মেঘ আমাদের সৌরমণ্ডল থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। এই মেঘের মধ্যে গিজ গিজ করছে অসংখ্য ধূমকেতু। মাঝে মাঝে তারা সেখান থেকে চলে আসে আমাদের সৌর-মণ্ডলে। এখানে এসে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তারপর আবার ফিরে যায় সেই মেঘেরই রাজ্যে। কহোতেক সেই উর্টে-র মেঘ রাজ্য থেকেই এসেছিল। সেইখানেই সে ফিরে যাচ্ছে এখন। বিচিত্র এই তথ্যটির কথা বলেছেন বিশিষ্ট ডাচ্ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জান উর্ট। ১৯৫০ সালে। তাঁর নামেই বিচিত্র ওই মেঘরাজ্যের নাম রাখা হয়েছে 'উর্টের মেঘ'। জান উর্টের বয়েস এখন আশীরও উপর। এই নিয়ে এখনও গবেষণা করছেন তিনি।

গণিতের সাহায্যে হিসেব নিকেশ করে উর্ট বলেছেন ওই মেঘের দূরত্ব পৃথিবী এবং সূর্য থেকে প্রায় ৫০০০০ থেকে, ১৫০০০০ 'জ্যোতিঃ একক' বা 'অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট।' তোমরা জানো হয়ত, এক জ্যোতিঃ—একক সমান ৯৩ মিলিয়ন মাইল। অর্থাৎ পৃথিবী এবং সূর্যের গড় দূরত্বের সমান। তা হলে বুঝতেই পারছো, কত দূরে সেই মেঘ-রাজ্যের অবস্থান।

উর্ট বলেছেন, বিচিত্র সেই মেঘ পৃথিবী থেকে দেখতে নীহারিকার মত। সেই মেঘরাজ্যের মধ্যে বিচরণ করছে কম করেও ২০০ বিলিয়ন ধূমকেতু। তারা ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কোন কোনটি মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ে আমাদের সৌরমণ্ডলে। ঢুকে পড়ার পর চলে আসে সূর্যের কাছে। তখন তাঁদের আমরা দেখতে পাই। আবার কোন কোন ধূমকেতু নেপচুন, শনি অথবা বৃহস্পতি গ্রহের কাছাকাছি এসে আবার ফিরে যায় তাদের মেঘরাজ্যে। এমন কথাও বলা হচ্ছে আজ থেকে ৪ বিলিয়ন বছর আগে অসংখ্য ধূমকেতু পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়েছিল। বুধ এবং শুক্র গ্রহের বুকেও আছড়ে পড়েছিল উর্টের মেঘরাজ্যের প্রচুর ধূমকেতু।

এ সব কথা ভাবলে কেমন অবাক মনে হয়? মনে হয় না ধূমকেতুগুলি সূর্যের কাছে এসেও সূর্যের প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের টান উপেক্ষা করে সৌরমণ্ডল ছেড়ে আবার ফিরে যায়?

ওয়েস্ট ধূমকেতু

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংগে এক প্যাকেট ম্যাজিক কার্ড সংগ্রহ করতে ভুলো না—যা বইয়ের মধ্যেই আলাদা ভাবে থাকবে।

—সম্পাদক।

সংবাদ

অসিতকুমার চক্রবর্তী

আরো একটি নতুন কোয়াসার

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ও বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আরো একটি নতুন কোয়াসার আবিষ্কার করেছেন। এটি পৃথিবী থেকে ২০০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে এবং এটি থেকে যে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা পৃথিবী সৃষ্টি হবার বহু আগেই ঐ কোয়াসার থেকে নির্গত হচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ায় বিজ্ঞান দপ্তরের মন্ত্রী ডেভিড অসমন গত মে মাসে এক বিজ্ঞান পত্রিকায় জানিয়েছেন যে দীর্ঘ ছ বছরে গবেষণা চালিয়ে এই আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটিকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। ১৯৬৩ সাল থেকে এ-যাবৎ শতাধিক কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের এক একটার বেতার শক্তি একটা সম্পূর্ণ গ্যালাক্সি যে পরিমাণ বেতার রশ্মি বিকিরণ করে তার প্রায় সমান। নতুন আবিষ্কৃত এই কোয়াসারটিকে "PKS-2000-330" নামে সূচিত করা হয়েছে।

ভাটনগর পুরস্কার ১৯৮১

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় ১৯৮১ সালের শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পেয়েছেন মোট নয়জন বিজ্ঞানী। ভৌত-বিজ্ঞানে এই পুরস্কার পেয়েছেন টাটা ইনস্টিটিউটের ডঃ এস. এম. রায় এবং বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ সায়েন্সের বিজ্ঞানী অধ্যাপক আর শ্রীনিবাসন। রসায়ন শাখায় এই পুরস্কার পেয়েছেন দুজন বিজ্ঞানী। সেন্টার ফর সেলুলার এণ্ড মলিকিউলার বায়োলজির অধ্যাপক ডি বালসুব্রাহ্মনিয়াম এবং বোম্বাই এর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজির অধ্যাপক বি. এম. দেব। জীব-বিজ্ঞান শাখাতেও দুজন বিজ্ঞানীকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এরা হলেন ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের ডঃ পি. ভি. সানে ও ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডঃ সুশীল কুমার। পদার্থ, রসায়ন ও বিজ্ঞান শাখায় যদিও পুরস্কারগুলি যৌথভাবে দেওয়া হয়েছে লক্ষ্ণৌর কে. জি. মেডিকেল কলেজের ডঃ ইউ. সি. চতুর্বেদীকে।

ইঞ্জিনীয়ারিং শাখার পুরস্কার পেয়েছেন অধ্যাপক এস. সি. দত্তরায়। শ্রীদত্তরায় বর্তমানে দিল্লীর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজির সঙ্গে যুক্ত আছেন। গণিত বিজ্ঞানের পুরস্কারটি পেয়েছেন অধ্যাপক জে. কে. ঘোষ। অধ্যাপক ঘোষ কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটের সহিত যুক্ত আছেন।

পুরস্কার প্রাপ্ত এই নয়জন বিজ্ঞানীর প্রত্যেকেই একটি করে মানপত্র ও নগদ কুড়ি হাজার টাকা সম্মান মূল্য পাবেন। গত ৩১ শে মার্চ দিল্লীর ন্যাশানাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া পরিবেশে এই পুরস্কার গুলি অর্পণ করেন অধ্যাপক নুরুল হাসান। অধ্যাপক হাসান কাউন্সিল অফ্ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চের সহ-সভাপতি। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নানা সাফল্যের কাহিনী বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেন।

হ্যালির ধূমকেতুর ফটো

বিজ্ঞানী হ্যালি কর্তৃক আবিষ্কৃত ধূমকেতুটি সর্বপ্রথম মানুষের সামনে আসে ১৯১০ খৃস্টাব্দের মে মাসে। এটি প্রতি ৭৫ বছরে সূর্যকে একবার করে প্রদক্ষিণ করে। এর মত উজ্জ্বল ধূমকেতু আজো দেখা যায়নি। এই ধূমকেতুটির আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এর অগ্রভাগ তথা মুণ্ডের ভর প্রায় তিন কোটি টন। শুধু কি তাই? এর পুচ্ছটির দৈর্ঘ্য একবার দুই কোটি মাইল হয়ে গেছিল। ১৯১০ খৃস্টাব্দে ১৯ শে মে পৃথিবী তার কক্ষ পরিভ্রমণ করার সময় ঐ সুদীর্ঘ পুচ্ছকে ভেদ করে চলে যায়। অথচ সেজন্য আমাদের ভূ-পৃষ্ঠের কোনোরূপ ক্ষতি হয়নি। এ যেন আশ্চর্য জ্যোতিষ্কটি আবার আমরা দেখতে পাবো ১৯৮৬ সালের মার্চ মাস নাগাদ। ঐ সময় এই আশ্চর্য ধূমকেতুটির ফটো তোলা হবে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে। সোভিয়েত রাশিয়া ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি গত ২৬শে জুন জানিয়েছেন যে তারা ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাবে এবং ঐ উপগ্রহ মারফত হ্যালির ধূমকেতুর পূর্ণাবয়ব ফটো তুলবে। জাপানও একটি উপগ্রহ—"প্ল্যানেট—A" মহাকাশে পাঠাবে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক। এদিকে বুডাপেস্ট সেন্ট্রাল ফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ষাটজন বিশেষজ্ঞ কম্পিউটার পদ্ধতি সমন্বিত একটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই তৈরী করে ফেলেছেন। আশা করা যায় এই সমস্ত মিলিত প্রচেষ্টার ফলে হ্যালির ধূমকেতু সম্বন্ধে আরো অনেক আকর্ষণীয় খবর পাওয়া যাবে। অবশ্য এজন্যে আমাদের এখনো কিন্তু আরো চার চারটে বছর অপেক্ষা করতে হবে।

৫৮৬, ব্লক—এন, নিউ-আলিপুর, কলিকাতা-৫৩।

মাছরাঙা পাখিদের কথা

অজয় হোম

নীলকণ্ঠ বর্গে (অর্ডার কোরাসিয়িফর্মেস) পৃথিবীতে ১০টি বংশ এবং ১৯২টি প্রজাতি আছে। তার মধ্যে ভারত ও তৎসংলগ্ন স্থানে দেখা যায় ৫টি বংশ—মৎস্যরঙ্গ (আলসেডিনিদি), শার্ঙ্গ (মেরোপিদি), নীলকণ্ঠ (কোরাসিয়িদি), প্রিয়াশ্রমঙ্গ (বুসেরোটিদি) ও পুত্রপ্রিয় (উদ্‌পিদি) এবং ৬০টি প্রজাতিকে। এরা সবাই যুগ্মাঙ্গুল গোষ্ঠীর (সিনড্যাকটাইলাস) পাখি।

নীলকণ্ঠ বর্গের অন্তর্গত মৎস্যরঙ্গ বংশের (আলসে-ডিনিদি) গঠনবৈশিষ্ট্য হল চঞ্চু লম্বা, মোটা এবং সূঁচাল। উপরের চঞ্চু হয় গোল, না হয় কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা। লম্বা চঞ্চু সোজা; শার্ঙ্গ বংশীয়দের মতো বাঁকা নয়। পা দুর্বল। চতুর্থ বা বাইরের আঙুল তৃতীয়ের সঙ্গে অর্ধেকের বেশি জোড়া এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের মধ্যে কেবল তলার দিকটা যুক্ত।

ভারতে মৎস্যরঙ্গ বংশে ৫টি গণ – মণিচক (অ্যালসেডো), বকতুণ্ডী (পেলারগপসিস), কপর্দিক (কেরাইল), কিকীদিবি (হ্যালসিওন) এবং দিদিবি (কেয়িকস্)।

মাছরাঙা

পাখি চেনা, তাদের জানা তাদের লক্ষ্য করার প্রথম যুগে শিকারের সঙ্গে মাছ ধরার নেশাও ছিল।

শেয়ালদা-ডানকুনি লাইনে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মাটি কেটে উঁচু করা হয়েছে, লাইনও পাতা হয়েছে। যাত্রী চলাচল অর্থাৎ লোকাল তখনও চালু হয় নি। এই লাইনের দুদিকে ছিল বড়ো বড়ো জলা। বলা হতো সি সি আর কাটিং। এখন বসতি হয়ে চেনা যায় না। ছিটেফোঁটা দু-একটা পুকুর হয়ে আছে। বেশির ভাগই ভরাট হয়ে গেছে। ওই সব জলায় মাছ ধরার জন্য পাস দিত চার আনায় (পঁচিশ পয়সা) একটা হুইল আর একটা হাত ছিপ। কোথাও যাবার না থাকলে বাসে করে দক্ষিণেশ্বর ও বরানগরের ডানলপ ব্রিজের কাছে নেমে যেতাম সেই বিরাট বিরাট জলায়। মাছও উঠত মন্দ নয়। মাছ না উঠলেও জলার ধারে হোগলা ও নলখাগড়ার বনের পাশে বসে প্রকৃতির নিস্তব্ধতার বাণী এবং তার মাঝে যে সংগীত উঠত তাতেই মন ভরে যেত। সেই আকর্ষণেও টেনে নিয়ে যেত বারে বারে সেই পরিবেশে।

চার-টার করে বেশ গুছিয়ে বসেছি। ফাতনার দিকে দৃষ্টি। মনে হচ্ছে চারে মিরগেল এসেছে। বিজকুড়ি কাটছে বড়ো বড়ো ঝাঁকে।

মাছরাঙা

পরিষ্কার দিন। আকাশে সাদা মেঘের সঙ্গে কিছু ধূসর মেঘের মেলামেশা। দুপাশেই নলখাগড়ার ঝোপ কিন্তু খুব ঘন নয়। ঝিমে টোপ ফেলে বসে আছি। বেলা এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা হবে হঠাৎ পিছনে একটা 'চি-চিই…চি-চি চিচিচি ই-ই' শব্দ শুনছি। কে যেন ঝড়ের বেগে আসছে। আমার বাঁ পাশে হাত ছয়-সাত দূরে নলখাগড়ার একটা ডাল জলের দিকে হেলে আছে তার উপর এসে বসল একটা পাখি। আহা, কি তার রঙ। সবুজ নীল বাদামী। শরীরের চেয়ে চঞ্চুটাই বড়ো। বেঁটেসোটা গড়ন মাথাটা নিচু করে চুপ করে

একদৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে আছে ঠিক আমি যেমন ফাতনার দিকে। মাথাটা থেকে থেকে ঝাঁক দিয়ে করছে উপর নীচ এপাশ-ওপাশ, সেই সঙ্গে চলছে বেঁড়ে লেজটির নাচন এবং মুখে আওয়াজ -'ক্লিক'। দুই মৎস্য শিকারী বসে আছে। একজনের জলের দিকে দৃষ্টি, অপর জনের ফাতনায়।

আমার ফাতনা না উপর দিকে উঠছে, না চাপ পড়ে অল্প নামছে, না কাঁপছে, একেবারে নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু। হঠাৎ ঝপ্ করে সোজা ডাইভ দিয়ে জলের মধ্যে পড়ে জল ছিটিয়ে ডুব। মুহূর্ত মধ্যে উঠে এল চঞ্চুর ফাঁকে ধরা আড়াআড়িভাবে একটা ছোটো মাছ। ঝড়ের বেগে উড়ে গিয়ে বসল একটু দূরে আর একটি শরের উপর। মাছটা ছটপট করছে। পাখিটার ভ্রূক্ষেপ নেই। ডালের উপর গোটা কয়েক ঠোকা দিয়ে কাবু করে মাথাটা গলার মধ্যে আগে নিয়ে গিলে ফেলল একগ্রাসে। তারপরেই জল ঘেঁসে প্রায় ছুঁয়ে উড়ে গেল—'চিচি-চিচি ই-ই' করতে করতে। ব্যর্থশিকারী আমিই কেবল ফাতনার দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

সার্থকশিকারী পাখিটা মৎসরঙ্গ বংশের মণিচকগণের (আলসেডো) এক প্রজাতি; নাম—মাছরাঙা ছোটো মাছরাঙা (আলসেডো অ্যাটথিস্)। হিন্দি—ছোট কিলকিয়া, নিকা কিলকিয়া। ইংরেজি—কমন কিংফিশার, ইণ্ডিয়ান স্মল ব্লু কিংফিশার।

মাছরাঙা লম্বায় ৭ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথার উপর সরু কালো নীলের টানা টানা দাগ। লম্বা ভারী সূঁচাল চঞ্চুর গোড়া থেকে চোখের নিচ হয়ে ঘাড়ের দুপাশে উজ্জ্বল বাদামী টান, তার শেষে সাদা ছোপ। চোখের সামনে কালো দাগ, চওড়া গোঁফের মতো টানা উজ্জ্বল নীল। উপরের পালক উজ্জ্বল নীল, ধারে এবং ডানায় সবুজভাব। ডানার লুকায়িত অংশ ও লেজের তলা পাটকিলে। চঞ্চু কালো; স্ত্রী এবং অপরিণত পুরুষের তলার চঞ্চুর গোড়া কমলা-লাল। পা প্রবাল লাল, দুর্বল, তৃতীয় ও চতুর্থ আঙুলের কিছু অংশ জোড়া। নখর ছাই রঙা।

বাসস্থান—মেরু অঞ্চল ছাড়া সমগ্র ইওরোপ ও এশিয়া, দক্ষিণে মালয়েশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত। ভারতের ৫টি প্রজাতির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যে প্রধান প্রজাত তার ৩টি উপজাতি। প্রথম (আ অ্যা বেঙ্গলেনসিস)—পাকিস্তান, নেপাল, সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫ হাজার ফুটের ভিতর। দ্বিতীয় 'সেন্ট্রাল এশিয়ান স্মল ব্লু' (আ অ্যা পালাসিয়ি) পাকিস্তান, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে। শীতে বা খরার সময় দক্ষিণে নেমে আসে রাজস্থান, উত্তর মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের সমতলে। গ্রীষ্মে ১৪ হাজার ফুটেও দেখা যায়। তৃতীয় 'সিলোন স্মল ব্লু' (আ অ্যা টাপ্রবানা)—দক্ষিণ ভারত, মধ্য বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশের ভূপাল, রাজস্থানের আবু পাহাড়, ওড়িশা এবং শ্রীলঙ্কায়। এদের নীল অংশ আরও গাঢ়। দ্বিতীয় প্রজাতি (আ মেনিনটিং) ব্লীনকান মাছরাঙা—নেপাল, সিকিম, ভূটান, আসাম, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, পশ্চিমঘাট, মহীশূর, কেরালা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও শ্রীলঙ্কায়; ঘন জঙ্গলের বাসিন্দা। তৃতীয় প্রজাতি (আ হারকিউলিস), বড়ো নীল মাছরাঙা সিকিম, ভূটান পূবে অরুণাচল, আসামের কাছাড় ও শ্রীহট্ট, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর বাংলাদেশ থেকে ব্রহ্মদেশ, উত্তর ভিয়েতনাম ও হাইনান দ্বীপপুঞ্জে গাঢ় চিরসবুজ জঙ্গলে গাছে ঢাকা স্রোতস্বতীর ধারে। লম্বায় ৮ ইঞ্চি।

খাদ্য—ছোটো মাছ, ব্যাঙাচি এবং জলজ কীট ও তাদের শূক।

স্বভাব—ছোটো মাছরাঙা বা মাছরাঙা বাংলার অতি পরিচিত জলের ধারের পাখি। যেখানেই পুকুর বিল খাল নালা জলাশয় সেখানেই মাছরাঙা। সময়ে সময়ে সমুদ্রের বাঁ খাঁড়ির কাছেও এদের দেখা যায়। সাধারণত খাদ্য সংগ্রহ করে জলের উপর ঝুলে থাকা গাছের ডাল, জলে পোতা বাঁশ বা নলখাগড়ার শর ইত্যাদির উপর বসে থাকে চুপ করে শিকারের আশায় কখন জলের উপর কিছু ভেসে উঠবে। কখনও কখনও ১০-১৫ ফুট উঁচু থেকে জলের উপর খাড়া দাঁড়ায়, ঘনঘন ডানা সঞ্চালন করে এবং সেখান থেকে মাথা নিচু করে ডাইভ খেয়ে শিকার ধরে।

মাছরাঙার ওড়া খুব দ্রুত এবং সোজাসুজি। 'চি-চি .. চি-চি-ই' ডাকতে ডাকতে জল ঘেঁষে ওড়ে। এই সময় ওদের রঙের বাহার চোখে পড়ে। ভয়ঙ্কর ঝগড়াটে পাখি। যে-জলের ধারে যে-জোড়া খাদ্য সংগ্রহের স্থান বেছে নেয় তার ধারে কাছে অপর কোনও জাতভাইকে একদম ঘেঁষতে দেয় না। নিজ চৌহদ্দি সম্বন্ধে এরা খুব সচেতন।

প্রজননকাল প্রধানত মার্চ থেকে জুন হলেও অনেক সময় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিম পাড়তে দেখা গেছে। বাসা বাঁধে সাধারণত জলের ধারে খাড়া পাড়ের মধ্যে গর্ত করে। জল থেকে দূরেও মাঝে মাঝে বাসা বাঁধতে দেখা যায়।

৮/২ বীরেশ গুহ স্ট্রীট, কলকাতা-১৭

এবার জগদীশচন্দ্র লণ্ডন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন।
-এইভাবে মনুষ্য দেহের প্রতিটি অংশ স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছে এবং তা নিখুঁতভাবে—
শুরু হল ডাক্তারী বিদ্যার প্রথম পাঠ
অদ্ভুত! মানব দেহের কি বিচিত্র গঠন!
কিন্তু জগদীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য সর্বদাই তাঁর পড়াশুনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে লাগল
আর ইউ ইল, মিঃ বোস?
নো, থ্যাঙ্কস্
না, মিঃ বোস তুমি অসুস্থ। তোমার গায়ে জ্বর। তুমি বাড়ি যাও, একটু বিশ্রাম নাও।
ঠিক আছে
বিশ্রাম নিলে কি হবে, আসামের সেই কাল জ্বর কিছুতেই তাকে ছেড়ে যেতে চাইল না।
ওফ! মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। আজ আবার প্রফেসর ল্যাঙ্কেস্টারের ক্লাস আছে। কলেজে না গেলেই নয়।
এই রকম অসুস্থতার মধ্যে দিয়েই চলতে লাগল জগদীশচন্দ্রের পঠন পাঠন আর অনুশীলন

ধারাবাহিক উপন্যাস

আগে যা ঘটেছে

[মফস্বল শহরে একটি ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়ে এসেছে সুশান্ত। ব্যাঙ্কের নাম অল ইণ্ডিয়া কমন পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। সংক্ষেপে এ. আই. সি. পি. লিঃ। একেবারে ম্যানেজারের চাকরি। ছোট্ট শহর। শহরের বুকের ওপরেই ছোট নদী। পরিবেশটা খুবই ভাল লেগেছে সুশান্তর। কিন্তু হঠাৎই ব্যাঙ্কে হয়ে গেল ডাকাতি। এবং অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে, ব্যাঙ্কের তালা না ভেঙে স্ট্রংরুম থেকে ডাকাতি হয়ে গেল বহু টাকা। এটা কি করে সম্ভব? স্ট্রংরুমের তালা খুলতে হলে তো দুটো চাবির প্রয়োজন হয়—যার একটা থাকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে, আর একটা সুশান্তর নিজের কাছে। তা হ'লে ডাকাতেরা তালা খুলল কি করে? একটু পরেই এল পুলিশ। সকলের জবানবন্দী নেওয়া হল। দেখতে দেখতে গোটা শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একজন ডিরেক্টর এলেন। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীই দোষ চাপাল সুশান্তর উপরে। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, লকারের দুটো চাবির একটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সুশান্ত ভীষণ ভেঙে পড়ল। অবশেষে তার বাবার বন্ধু সতীনাথ বাবুকে কলকাতায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সতীনাথ বাবু—ডিটেক্‌টিভই শুধু নন, বড় বৈজ্ঞানিক। ব্যাঙ্ক সুশান্তকে সাসপেণ্ড করল। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে এলেন নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। নাম মিঃ কে. সি. ত্রিবেদী এবং খুব সহজেই সকলের মন জয় করে নিলেন। আলাপ হল সুশান্তর সঙ্গেও। ছোট শহরের জীবন আবার স্বাভাবিক হয়ে এল—একমাত্র সুশান্ত ও ক্যাশিয়ার ছাড়া। সরযূপ্রসাদেরও কোন খবর নেই। লোকটা কি বেপাত্তা হয়ে গেল?]

ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুশান্ত। বাজার থেকে টুকিটাকি দু'-একটা জিনিস কিনে নিয়ে এবার বাড়ি ফিরবে। তার পরই অখণ্ড অবসর। নির্জন বাড়িতে কিছুই করবার নেই, একটা কথা বলারও লোক নেই। নিঃসঙ্গ জীবন যে এতটা পীড়াদায়ক হতে পারে এ সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি।

ক্লাবের লাইব্রেরী থেকে খান কয়েক হাল্কা গল্পের বই নিয়ে এসেছে—স্রেফ সময় কাটাবার জন্য। হাল্কা বলতে একেবারেই হাল্কা। তাঁর বেশির ভাগই ইংরেজী গোয়েন্দা কাহিনী। সস্তা আগেকার দিনের দু'-পেনী-নভেলের মত। একবার পড়লে দ্বিতীয় বার আর পড়া যায় না, এবং কিছুদিন পরেই গল্পের বিষয়বস্তু বেমালুম ভুলে যেতে হয়। এত বাজে বই লোকে লিখতে পারে! —সুশান্ত মনে মনে ভাবে। আর ধন্যি পাঠকবর্গ! এসব বইও লোকে কেনে, পড়ে, গেলে এবং হয়তো আনন্দও পায়! কিন্তু উপায় কি? এখানে ভালো বাংলা বই তো নেই বললেই চলে, হিন্দী যা আছে তাও সবই প্রায় নিম্নমানের। ইংরেজীও তাই। অবশ্য লাইব্রেরিয়ান যখন বইগুলো তার হাতে তুলে দেন তখন বলেছিলেন, পড়ে দেখবেন। একবার শুরু করলে শেষ না করে দম বন্ধ করতে পারবেন না। আরও জানিয়েছিলেন এ সব বই নাকি বেরোলে বাজারে পড়তে পারে না—সঙ্গে সঙ্গে "গরম গরম কেকের মত" বিক্রি হয়ে যায়। না জানি সে কি ধরনের কেক! —সুশান্ত মনে মনে ভাবে। কিন্তু ও-ছাড়া সময় কাটাবার অন্য কোন পথ সে খুঁজে পায় নি। কি জানি, কবে ওদের তদন্ত শেষ হবে, এই দুঃসহ নজরবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে সে। মুক্তি নিশ্চয়ই পাবে, কেননা সে তো নির্দোষ। ভগবান্ কি তাকে নিয়ে এমনি ছেলেখেলা চালিয়ে যাবেন?

আজকাল আর সুশান্ত নেহাৎ প্রয়োজনে ছাড়া রিক্সা চাপে না, হেঁটেই চলাফেরা করে। এখন সময়ের কোন মূল্যই নেই তার কাছে। তা ছাড়া এখানকার রিক্সার বিকল্প হচ্ছে এক্কা। ছেলেবেলায় হাসিখুশিতে পড়েছিল "এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে।" সত্যিকার এক্কা দেখে তার তো চক্ষু চড়ক গাছ। যেমন গাড়ির চেহারা, তেমনি ঘোড়ার। এবং বিংশ শতাব্দীতে এ-হেন বাহন কি করে টিকে থাকতে পারে সেও একটা বিস্ময় সুশান্তর কাছে।

বাড়ি যাবার পথেই পোস্ট অফিস। চিঠিপত্র কিছু আছে কিনা খোঁজ নেবার জন্য সুশান্ত একবার সেখানে ঢু' মারতে গেল। পিয়ন কখন বাড়িতে চিঠি দিয়ে যাবে তার

জন্য অপেক্ষা করতে হলে হয়তো দিন কাবার হয়ে যাবে। তাই সকলেই, সুবিধা থাকলে, ডাকঘরে এসে নিজের নিজের নামের চিঠি নিয়ে যায়। এসব দেশে সেইটেই দস্তুর। হয়তো এই জেবেই কর্তৃপক্ষও পিয়নের সংখ্যা যত কম রাখা যায় তাই রেখেছেন।

পোস্ট অফিসে ঢুকতেই তাদের বিটের পিয়ন তার হাতে একখানা খামেমোড়া চিঠি গুঁজে দিল। সুশান্ত পোস্ট অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়েই খুলে ফেলল চিঠিখানা। মা লিখেছেন। ইদানীং সুশান্ত চিঠিপত্র কম দেওয়ায় খুব চিন্তিত তিনি। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাবার জন্য জোর তাগিদ আছে চিঠিতে। তাছাড়া গোপার বিয়ে প্রায় ঠিক, এ সময় তার সাহায্যেরও বিশেষ দরকার। গোপা সুশান্তর ছোট বোন।

কয়েক দিনের ছুটি। সুশান্ত মনে মনে হাসল। সে যে এখানে পুলিশের নজরবন্দী, মা তো আর তা জানেন না। আর জানিয়ে লাভই বা কি, শুধু শুধু মা'র মন খারাপ করানো ছাড়া। চিঠিখানা বুকপকেটে রেখে সুশান্ত আবার বেরিয়ে পড়ল পোস্ট অফিস থেকে।

বেলা ধীরে ধীরে বাড়ছে। এখন আর রোদে ঘুরে ঘুরে সময় না কাটিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো। সুশান্ত তাই বাড়ির দিকেই পা বাড়াল।

বাড়ি ফিরেই সে অবাক্। সামনের বারান্দায় কে একজন বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। কাগজের আড়ালে মুখটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মাটিতে লুটানো কোঁচার খুঁট আর গোদা গোদা পায়ে বিদ্যেসাগরী চটি দেখে বুঝতে পারল লোকটি বয়স্ক। ছেলে ছোকরারা আজকাল আর কেউ ধুতি পাঞ্জাবী বড় একটা পরে না। বাইরে তো নয়ই, বাড়িতেও অনেকেই পায়জামা পরে কাটায়। কাজেই, কাউকে ধুতি পরতে দেখলে সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে এ লোকটির নিশ্চয়ই বয়স হয়েছে, নইলে ধুতির ওপর মোহ কাটেনি কেন? তার ওপর ঐ বিদ্যেসাগরী চটি? ওটাও তো বয়সের লক্ষণ।

কিন্তু শীগ্‌গিরই সব সন্দেহের নিরসন হ'ল। ভদ্রলোক কাগজটা একটু ওল্টাতেই সুশান্তর সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে গেল। আরে, এযে সতীনাথকাকা! কখন এলেন! কই, একটা খবরও দেন নি তো আসবার আগে!

সতীনাথ বাবু মৃদু হাসি হেসে বললেন, তুমিও রওনা হলে আমিও এসে পৌঁছলাম। তা অতিথি সৎকারের কোন ত্রুটি হয় নি। ঐ যে ছেলেটি তোমার সব কাজ করে, কি নাম যেন?—ও, ভগলু। হ্যাঁ, ভগলুই তোমার অনুপস্থিতিতে অতিথি আপ্যায়নের ভার নিয়েছে। চা, বিস্কুট, লাড্ডু সবই এনে খাইয়েছে। একটু আগে জিজ্ঞেস করে গেল, আমি নিরামিষ খাই না, আমিষ খাই। মাংস না খেলে কি মাছ আমার পছন্দ ইত্যাদিও খুঁটিয়ে জেনে নিল। তারপর এই মাত্র বোধ হয় বাজারে বেরিয়েছে। তা তুমি জামাকাপড় ছেড়ে একটু জিরিয়ে নাও, তারপর কাজের কথা হবে। কেন হঠাৎ খবর না দিয়েই এলাম সে সব কথা বলব।

সুশান্ত একটু অস্থির হয়ে বলল, "না না, আমার নাইতে খেতে এখনও অনেক দেরী। আপনি বরঞ্চ এখনই বলুন। আপনাকে দেখে মনটা আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

সতীনাথ বাবু একটু স্মিতহাস্যে বললেন, "চঞ্চল হবার কিছু নেই। গোটা পৃথিবীটাই তো একটা রঙ্গমঞ্চ সেই যে ক'শ বছর আগে কবি শেক্সপীয়ার লিখে গিয়েছিলেন না? সেই রঙ্গমঞ্চ এখনও রয়েছে এবং আমরা সবাই সমান দাপটে সেখানে অভিনয় করে যাচ্ছি—যাকে যে ভূমিকা দেওয়া হয়েছে সেই ভূমিকায়। তোমার যেমন একটা ভূমিকা আছে এতে, আমারও তেমনি আছে। ঠিক-মত নিজের ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হবে মুষড়ে গেলে চলবে কেন?"

সুশান্ত বাধা দিয়ে বলল, "কাকা, আপনার কথাগুলো বড় হেঁয়ালী করে বললেন, একটু খোলসা করে বলুন। আপনি আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ না জানিয়ে কেন এলেন তাই বুঝতে পারছি না।"

সতীনাথ বাবু তেমনি হাসিমুখে বললেন, "বলছি, বলছি, শোন। কিন্তু আমাদের অনেক সময় এমন সব কাজ করতে হয় যার কারণ আগে জানালে চলে না। আপাততঃ জেনে রাখ এখানকার গোয়েন্দা পুলিশের কর্তারাই আমার সাহায্য চেয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তবে আমিও যে ওদের সঙ্গে আছি, তোমার আত্মীয়-বন্ধু হিসেবে বেড়াতে আসি নি, সে কথাটা সর্বসমক্ষে রাষ্ট্র করার কোন দরকার নেই।"

একটু থেমে সতীনাথ বাবু আবার বললেন, "তোমার মনে আছে বোধ হয়, ব্যাঙ্কের সেদিনকার সেই ঘটনার পর আমরা স্ট্রংরুমের দরজায়, বা তার হাতলে কারও আঙুলের ছাপ আছে কিনা তা পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করেছিলাম। তুমি তো জান, পৃথিবীর কোন লোকের সঙ্গে অপর কোন লোকের আঙুলের ছাপ কখনও এক রকম হয় না, একটু প্রভেদ থেকেই যায়। আর, অপরাধী যদি অপরাধ করতে এসে আচমকা কোন কিছু ধরেও তা

হলে তার আঙ্গুলের একটা ছাপ, তা সে যত অস্পষ্টই হোক না কেন, সেই জিনিসটার গায়ে লেগে থাকবেই। গোয়েন্দাদের কাছে এমন সব পাউডার থাকে যা ঐ অস্পষ্ট ছাপের ওপর ছড়িয়ে দিলে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর সম্ভব হলে জিনিসটা তুলে এনে, কিংবা সম্ভব না হলে খুব সেন্‌সিটিভ ক্যামেরায় তার ফোটো তুলে এনে সে ছাপ পরীক্ষা করে দেখা হয়। তোমাদের ব্যাঙ্কেও স্ট্রং রুমের হাতলের ওপর ওরকম ছাপ আছে সন্দেহ হওয়ায় আমি তার উপর পাউডার ছড়িয়ে ফোটো নিতে বলেছিলাম, আর এখানকার পুলিশ কর্তৃপক্ষ তা নেবার ব্যবস্থাও করেছিলেন। সম্প্রতি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে সে ছাপের যে চেহারা পাওয়া গেছে তাতে আমি তাজ্জব বনে গেছি। তাই আবার খোঁজ খবর নেবার জন্য আর একবার আসতে হয়েছে এখানে। সে ছাপের একটা ফোটো আমার কাছে আছে, দেখতে চাও?"

সতীনাথ বাবু একটু থেমে তাঁর হাতের কাছে রাখা অ্যাটাচিটা খুলে খুব সন্তর্পণে একটা মোড়ক বার করলেন, তারপর সুশান্তর সামনে তা খুলে ধরে বললেন, "দেখে চিনতে পার, কার আঙ্গুলের ছাপ?"

সুশান্ত ঝুঁকে পড়ে প্রতিকৃতিটা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল, তারপর বলল, "একি মানুষের হাতের আঙ্গুল? সে রকমটা মনে হচ্ছে না তো! মানুষের আঙ্গুল কি এত লম্বা হয়? এ যে দেখছি পাঁচটা আঙুল প্রায় সমান লম্বা!"

"হুঁ, মানুষের হয় না, কিন্তু মানুষের কোন কোন জাত-ভাই-এর হয়।" সতীনাথ বাবু গম্ভীর ভাবে বললেন।—"শিম্পাঞ্জীর হাত দেখেছ কখনও? কিংবা কোন বড় জাতের বানরের হাত?"

সুশান্তর মনে পড়ল, সে দেখেছে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গেলেই বাঁদরের খাঁচার কাছে আসতেই বাঁদরগুলো খাঁচার শিকের ফাঁক দিয়ে হাত বার করে দিয়ে হাত পাতত কিছু ছোলা বা ঐ জাতীয় খাবার দেবার মৌন অনুরোধ জানিয়ে। ছেলেবেলায় যখনই সে চিড়িয়াখানায় গেছে এরকম ছোলা কিনে নিয়ে গেছে ফটকের সামনে থেকে—বাঁদরদের খাওয়াবার জন্য। এইভাবে একবার সে একটা শিম্পাঞ্জীকেও খাবার দিতে গিয়েছিল, অবশ্য ওখানকার পাহারাদারদের নিষেধে শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

...একি মানুষের হাতের আঙ্গুল?

কিন্তু খাবার না পেলেও শিম্পাঞ্জীও তার প্রসারিত হাত ওর সামনে তুলে ধরতে ছাড়েনি। কালো লোমশ হাত, কিন্তু হাতের তালুটার সঙ্গে মানুষের তালুর আশ্চর্য মিল। তফাৎ শুধু আঙ্‌লগুলোয়। ওদের হাতের বুড়ো আঙ্‌লটা মোটেই মানুষের মত নয় - অস্বাভাবিক লম্বা। গাছের ডাল ভালো করে আঁকড়ে ধরার জন্যই যে আঙ্‌ল ঐ ভাবে গড়ে উঠেছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। শুধু হাত নয়। শিম্পাঞ্জীর পায়ের পাতাও মানুষের মত হলেও, সেখানকার আঙ্‌লগুলোও অমনি অসম্ভব লম্বা। ওরা তো হাতের মত পা-টাকেও গাছের ডাল আঁকড়ে ধরার জন্য একই ভাবে ব্যবহার করে কিনা তাই এই ব্যবস্থা।

শুধু শিম্পাঞ্জী কেন, সুশান্তর মনে পড়ল, সে আরও অনেক জাতের বাঁদরের হাতের তালুর গড়ন প্রায় ঐ একই রকম দেখেছে। একবার ওরা পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিল। মন্দিরের কাছের-বাজার থেকে এক কাঁদি কলা কিনে নিয়ে যাবার সময় একটা মুখপোড়া হনুমান তাকে তাড়া করেছিল। সে ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগিয়েছিল, হনুমানও তার সঙ্গ ছাড়েনি। শেষে রাস্তায় এক ভদ্রলোক বললেন, 'শীগ্‌গির ওকে একটা কলা দিয়ে দিন, নইলে ও ছাড়বে না।' সুশান্ত গোটা কলার কাঁদিটাই ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রেহাই পেয়েছিল। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই হনুমানটার হাতের তেলো-- তার লম্বা লম্বা বুড়ো আঙ্‌লের কথা। কিন্তু শিম্পাঞ্জী তো ঠিক বাঁদর নয়। মানুষের আরও নিকট জাতি। ওকে আমরা তাই বলি এপ্ বা বনমানুষ। গরিলা তার ওরাংওটানও এই দলের।

সুশান্ত অবাক্ বিস্ময়ে বলল, "তবে কি কোন শিম্পাঞ্জীর কাজ ওটা?"

সতীনাথ বাবু হাসতে হাসতে বললেন, দাঁড়াও অত চট্ করে রহস্যের সন্ধান যদি হয়ে যেত তা হলে তো ডিটেক্‌টিভদের কেউ পাত্তাই দিত না। ভালো করে দেখ ফটোটা। আঙ্‌লটা দেখতে শিম্পাঞ্জী গোছের কোন বড় জাতের বানর বা এপ্-এর বলে মনে হলেও আমার তো মনে হয় ওটা আরও একটু বড়। বাঁদরের নয় নিশ্চয়ই, অন্য কোন এপ্ টেপ-এর যাকে তোমরা বল বনমানুষ,- হলেও হতে পারে। সত্যি কোন্ জনোয়ারের তা কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ অর্থাৎ জুয়লজি-জানা বিশেষজ্ঞকে দিয়ে না পরীক্ষা করিয়ে বলা কঠিন। যাই হোক্, একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে, স্ট্রং রুমের সামনে বাঁধানো মাটিতে ও-রকম কোন পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি—যদিও সেখানটায়ও বেশ একটু ধুলো জমে ছিল। সেখানে যে সব পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে তা দেখে মনে হয় সেগুলি কোন জুতোর ছাপ। এলোমেলো অনেকগুলো ছাপ আছে, তোমাদের ব্যাঙ্কের লোকদেরও হতে পারে—তোমারও হতে পারে; কারণ জায়গাটা ভালো করে নিয়মিত ঝাঁট দেওয়া হয় বলে মনে হয় না। শিম্পাঞ্জী বা অন্য কোনও বাঁদর যদি এসেও থাকে, সেকি রবারের জুতো পরে আসবে?"

সুশান্ত আবার হতাশ ভাবে বলল। "তবে?"

সতীনাথ বাবু তেমনি হাসতে হাসতে বললেন, "ঘাবড়িও না, জট যখন ছাড়াতে এসেছি, ছাড়িয়ে যাবই। তবে একটু সময় লাগবে হয়তো।...যাক, এখনই কিন্তু আমাকে একটু বেরোতে হবে। তোমার জন্যই শুধু অপেক্ষা করছিলাম। তোমার ভগলুকে বল একটা রিক্সা টিক্সা ডেকে দিক্।"

খবরের কাগজটা মুড়ে সুশান্তর হাতে দিয়ে সতীনাথ বাবু উঠে দাঁড়ালেন।

[ক্রমশঃ]

খুদে বৈজ্ঞানিক/দিলীপ দাস

জীব-রহস্য সন্ধানী—জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার (১৮৬৪- ৯৪৩)

রেখা দাঁ

১৮৬৪ সাল। আমেরিকার সর্বত্র চলেছে গৃহযুদ্ধের অরাজকতা। এক অশিক্ষিত ক্রীতদাস নিগ্রো পরিবারে এমন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করল. যে পরবর্তকালে বিখ্যাত হয়েছিল একজন উদ্ভিদ্-রসায়নবিদ্ হিসাবে। মানব কল্যাণে তাঁর অবদান নানা সংগ্রামী-প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ হয়ে আছে। দরিদ্রতা, কঠোর সংগ্রাম, ন্যায়বোধ এবং আদর্শের উজ্জ্বল-ভাস্বর এই দরদী-বিজ্ঞানী হলেন—জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।

বাবা ছিলেন কৃষক। আমেরিকার মিসৌরী-শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ডায়মণ্ড গ্রুভের একটি গ্রামে মসেস্ (moses) কার্ভারের উপনিবেশে তাঁর মা থাকতেন। মসেস্ কার্ভারের উপনিবেশটি ছিল আরকানসাস্ (Arkansas) সীমানার কাছাকাছি। একদিন হানাদাররা এল হিংস্রতা-বর্বরতার আক্রোশ নিয়ে। লুঠ করে নিয়ে গেল শিশু কার্ভার ও তার মা-কে। মসেস কার্ভার বহু চেষ্টা করেও শিশু-কার্ভার-এর মাকে পেলেন না, শিশু কার্ভারকে। তিনি উদ্ধার করলেন বহু কষ্টে।

যুদ্ধ থামলো। মুক্ত হলেন হাজার হাজার ক্রীতদাসরা। জর্জের জীবন শুরু হোল যদিও স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে;

জর্জের বয়স তখন দশ। কাছাকাছি স্কুল বলতে ছিল আট মাইল দূরে নিওশো-তে। মসেস কার্ভার বললেন তুমি যখন চাইছ, তখন তোমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেব। কিন্তু তোমার নিজের খরচ. নিজেই চালাতে হবে। শূন্য পকেটে নিওশো-তে হাজির হল জর্জ। নতুন জীবনের আশায়। থাকতেন একটি জীর্ণ কুটিরে; আহারের সংস্থান হোত স্কুলের পরে অন্য বাড়ীতে চাকরের কাজ করে। কিন্তু পড়াশুনার ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ক্রমেই বাড়তে থাকল। কয়েক বছর পর ৬০ মাইল দূরের কনসাস-এ হাইস্কুলে ভর্তি হলেন তিনি। এখানে তিনি খচ্চরে টানা গাড়ী চালাতেন. পরে ধোপার কাজ নিলেন, হাইস্কুলের পড়া শেষ করে (Iowa)-আওয়া-র সিম্‌সন্ কলেজে ভর্তি হলেন। তিন বছর পড়াশুনা চালালেন লণ্ড্রী করে।

১৮৯০ সাল। জর্জের বয়স তখন ২৬। ভর্তি হলেন Iowa State college-এ। চার বছর পর তিনি হলেন কৃষি-স্নাতক। ১৮৯৬ সালে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রীও পেয়ে গেলেন, ইতিমধ্যে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কলেজে তিনি কাঁচের ঘরে রাখা বিশেষ জাতের উদ্ভিদের উপর পর্যবেক্ষণ করতেন।

পড়া শেষ করে তিনি চাকরী নেন আলাবামার নিগ্রো কলেজ তাসকিগী ইনস্টিটিউটে। এখানে এসে কার্ভারের জীবনের আর এক নতুন পর্যায় শুরু হোল। এখানে তিনি কৃষিগবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন। কৃষি-গবেষণার ফলাফল দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করল। প্রথম তিনি সৃষ্টি করলেন উন্নত জাতের তুলার সঙ্কর বীজ, পরপর তিনি বাদাম, মিষ্টি আলু, সয়াবীন প্রভৃতির নতুন নতুন উচ্চ ফলনক্ষম সঙ্কর বীজ সৃষ্টি করলেন। কৃষকদের বোঝাতে লাগলেন—এসব গবেষণার সম্ভাবনা চাষের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন আনতে পারবে। কার্ভার নিজেও অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ী মন নিয়ে কঠোর গবেষণায় নিমগ্ন রইলেন।

কার্ভার খ্যাতনামা হলেন বাদাম-চাষী হিসাবে। বাদামের মধ্যে জটিল রাসায়নিক যৌগাদি আছে। যেমন-চর্বি, তৈল, আঠা, চিনি, রঞ্জন ইত্যাদি তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। তিনি এও দেখিয়েছিলেন। এই সব পদার্থ দিয়ে কৃত্রিম দুধ, মাখন, কফি, ময়দা, শেভিং লোসন, প্রসাধন দ্রব্য, কালি ইত্যাদি তৈরী করা যায়, বাদাম থেকে তিনি ৩০০ রকমের বিভিন্ন পদার্থ তৈরী করেছিলেন। আর মিষ্টি আলু থেকে ১১৮ রকমের পদার্থ তৈরী করেছিলেন।

বিনম্র স্বভাবের এই বিজ্ঞানী জীবনে বহু খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছিলেন। একবার টমাস আলভা এডিসন তাঁর কাজের জন্য প্রতি বছর ২৫০০০ ডলার দেবেন বলেছিলেন, পরিবর্তে তাঁর গবেষণার ফলাফল নতুন শিল্প (Industry) স্থাপনের জন্য গোপন রাখা হবে। কিন্তু তিনি তাতে রাজী হন নি। অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন তিনি। আঁকতে ভালোবাসতেন। রং তিনি রঞ্জক পদার্থ দিয়ে নিজেই বানাতেন। হস্তশিল্পেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল, নিজের গলাবন্ধ বা নেকটাই নিজেই বুনতেন। প্রচুর অর্থের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। তাঁর গবেষণার ফলাফল সাধারণ মানুষের উপকারে লাগছে, এটা জেনে আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন, ১৯৪৩ সালে এই মহান মানব দরদী বৈজ্ঞানিকের জীবনাবসান হয়।

গোবরডাঙা রেনেশাঁ ইনস্টিটিউট, পোঃ খাটুরা, ২৪ পরগনা।

ঢাল

প্রদীপকুমার বসু

আত্মরক্ষা জীবের একটি সাধারণ ধর্ম, আর তাই প্রত্যেক জীবই চেষ্টা করে কোন না কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করার। যেমন আমাদের কথাই ধর না, আজকালকার দিনে যাঁরা বাইক বা স্কুটার চালান তাদের মাথায় থাকে হেলমেট, ফেনসিং খেলোয়াড়ের বুকে হাতে থাকে লোহার পাতের শক্ত আবরণ, আবার সর্বাধুনিক যুদ্ধ উপকরণ ট্যাঙ্ক তো পুরু ইস্পাতের চাদর নির্মিত একটি শক্তিশালী মারণাস্ত্র। কিন্তু মানুষের যেমন বিচিত্র কাজ তেমনই তার আঘাত থেকে রক্ষা পাবার উপকরণ। আর প্রকৃতির রাজ্যে কত জীব শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদে কি ভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে তা জানলে অবাক হতে হয়।

এই রকম একটি আশ্চর্য প্রাণী হ'ল প্যাঙ্গোলিন। সাধারণ ভাবে এরা স্তন্যপায়ী পিপীলিকাভূক প্রাণী। এই প্রায় দুই ফুট লম্বা প্রাণীটির মাথার অগ্রভাগ থেকে লেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শক্ত খোলা দিয়ে প্লেট মাছের আঁশের মত সাজানো থাকে। দেহের তুলনায় এদের মাথাটা আশ্চর্য রকমের ছোট, সেই জন্য এদের বুদ্ধিটা একটু খাটো হয়। যাই হোক আত্মরক্ষায় এরা কিন্তু মোটেই অত বোকা নয়। এদের এই প্লেটগুলো তৈরী সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলেন যে পূর্ব পুরুষদের গায়ের লোমগুলি পাশাপাশি কোন দেহ নিঃসৃত আঠার সাহায্যে জুড়ে গিয়ে প্লেট তৈরী হয়ে গিয়েছে। এই প্লেটগুলোর প্রান্ত ভাগ খুব ধারালো হয়। কিন্তু মাথায় আর পেটের দিকে কোন রকম শক্ত প্লেট থাকে না।

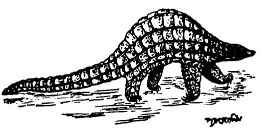

নৈশভ্রমণ কালে এরা যদি কোন অনুসন্ধিৎসু শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে এরা গুটিয়ে গিয়ে বলের আকার ধারণ করে। যেহেতু পেটের দিকটা দুর্বল তাই মাথাটাকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে লেজ দিয়ে পেটের খোলা জায়গাটা চাপা দিয়ে রাখে। আর পিঠের দিকে শক্ত ধারালো প্লেটগুলো ছুরির ফলার মত খাড়া হয়ে শত্রুকে দূরে সরিয়ে রাখে।

এই প্যাঙ্গোলিনদের নাম পিপীলিকাভূক হল কেন জান? এরা অতি তৎপরতার সঙ্গে লম্বা সাপের জিবের মত জিব দিয়ে পিপঁড়ে ধরে খায়, এদের জিবগুলো চটচটে আঠালো হয় বলে পিপঁড়ে বা উইপোকা একবার আটকে গেলে আর নিস্তার নেই। আর সেইজন্য এদের শিকার ধরার পদ্ধতি অতি অদ্ভুত, পিপঁড়ে বা উইপোকার গর্ততে জিবটা প্রথমে ঢুকিয়ে দেয়। আর যেই শত্রু ভেবে পিপঁড়েরা জিবকে আক্রমণ করে, অমনি জিবের সঙ্গে সব আটকে যায়। তখন প্যাঙ্গোলিন তার জিবটা মুখে ঢুকিয়ে নেয়। এদের দাঁত নেই তাই পাকস্থলীর পেষক যন্ত্রে চূর্ণ করে নেয়, সংগৃহীত খাবারকে। আমাদের দেশে দক্ষিণ ভারতে এদের কয়েকজনকে এখনও দেখা যায়। আর কিছু আফ্রিকা মহাদেশে দেখা যায়।

আর একটি এই রকম প্রাণী দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে, এরাও এক রকম শক্ত আবরণ যুক্ত প্রাণী। আর প্যাঙ্গোলিনেরই স্বজাতি এই প্রাণীটি হ'ল আর্মাডিলো, খাদ্যগ্রহণের দিক থেকে এরাও পতঙ্গভূক। আর্মাডিলোর আবরণ একটু অন্য রকম, এদের আবরণ অস্থিনির্মিত পদার্থ দ্বারা তৈরী এবং দেহের চামড়ার উপর অবস্থান করে, খাদ্য সন্ধানে যখন এরা বেরোয় তখন সাধারণত এরা কোন শত্রুকে ভয় পায় না। তবুও যদি কোন প্রাণী এদের সম্বন্ধে আগ্রহ দেখায় তাহলে প্যাঙ্গোলিনের মত আর্মাডিলো পেটের দিকে পিঠটা ধনুকের মত বেঁকিয়ে গোল বলের আকার ধারণ করে। এই সময় যদি শত্রুটি তাকে ধাক্কা দেয় তাহলে একটা নির্জীব বলের মত গড়িয়ে যায়। আর্মাডিলোরা সাধারণত নিশাচর হয়, যত রকমের আর্মাডিলো পাওয়া যায়, তা সবই খুব একটা বড় হয় না। মোটামুটি তিনফুটের মত লম্বা হয়, যদিও এদের পূর্ব পুরুষেরা এদের মত এত ছোট ছিল না।

প্যাঙ্গোলিনের আর আর্মাডিলোর মত বিস্ময়কর প্রাণীদুটিকে আমরা সহজেই দেখতে পাব যদি জহরলাল নেহরু রোডের ভারতীয় যাদুঘরের ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী কক্ষে যাই।

আরেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর কথা না উল্লেখ করলেই নয়, যাকে তোমরা অনেকেই কলিকাতার চিড়িয়াখানায় দেখেছ। সে হল আমাদের অতি পরিচিত এক শৃঙ্গ গণ্ডার, পূর্ণ বয়স্ক গণ্ডারের দেহের উপরিভাগের চামড়া এত পুরু ও শক্ত যে পুরাকালে এই চামড়া দিয়ে যুদ্ধের ঢাল

প্রস্তুত হত। বুঝতেই পারছো যে তরোয়াল, বর্শা ইত্যাদি তীক্ষ্ণ অস্ত্র এই চামড়াকে ভেদ করতে পারে না। এমন কি দেহের বিশেষ বিশেষ জায়গাতে সময় সময় বন্দুকের গুলিও প্রতিহত হতে দেখা যায়।

আর্মাডিলো

তোমরা দেখেছো তো কচ্ছপের উপরের খোলাটা কত শক্ত আর মজবুত, যদি বিপদের গন্ধ পায় তাহলে এদের হাত পা, মুখ, লেজ সবই তার ঐ মজবুত বর্মের ভিতর সেঁধিয়ে যায়। এদের এই বর্ম আবার প্রজাতি ভেদে অনেক ধরনের হয় আর তার জন্যই সে যে পরিবেশে থাকে সে পরিবেশের সঙ্গে এমন মিশে থাকে যে অন্যের পক্ষে সনাক্ত করাই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

পৃথিবীর সব শামুকেরই মাংসল দেহের বাইরে একটি শক্ত ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের খোলক দ্বারা আবৃত থাকে। আর ঐ খোলকই তাদের বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করে। চলাফেরার সময় খোলকটা দেহের উপরের দিকে নিয়ে গমন করে আর সামান্য বিপদের গন্ধ পেলে ঐ খোলার মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। শামুক জাতীয় প্রায় সব জীবেরেই দেহ এই রকম শক্ত কঠিন আবরণে আবৃত থাকে।

কথায় আছে বুদ্ধি যার বল তার। সন্ন্যাসী কাঁকড়ার নাম শুনেছ নিশ্চয়। এদের নরম দেহের বাইরে কোন শক্ত আবরণ থাকে না। তাই এরা করে কি জান? মৃত শামুকের পরিত্যক্ত খোলকের মধ্যে নিজেদের দেহটাকে ঢুকিয়ে রাখে আর শুধু চলাফেরার জন্য অগ্রভাগকে খোলার বাইরে রাখে, অবশ্য এ বিষয়ে এদের একটি সহজাত দক্ষতা আছে। দেহের বৃদ্ধি হলে ছোট সন্ন্যাসী কাঁকড়ার বড় শামুকের খোলের দরকার হয়। তখন এরা সমুদ্রের তীরে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত শামুকের খোলের সন্ধানে থাকে। এদের বড় দাঁড়াটির সাহায্যে কোন শামুকের খোল ধরে বুঝতে পারে যে যাতে আছে, তার থেকে এটি বড় কিনা। এবং সেটি বড় অনুমিত হলে প্রাণীটি তার খোলাটি বদলি করে নেয়।

দেওয়ালীর রাতে দেখবে বিজলী বাতির গায়ে ঠক্ করে ধাক্কা দিয়ে কিছু পতঙ্গ মাটিতে এসে পড়বে। তাদের একটা ধরে পরীক্ষা করলে দেখতে পাবে যে তাদের গায়ের বর্মটা কত শক্ত. আর গুবরে .পাকার কথা জানইতো যে দেহটা ওদের খোলা দিয়ে ঢাকা থাকে। এই শক্ত খোলার বর্মযুক্ত পতঙ্গদের এক সাথে বলে বিট্‌ল, আর কাঁকড়া, চিংড়ী জাতীয় সন্ধিপদী প্রাণীদের আত্মরক্ষা করার শক্ত সাঁড়াশীর মত দাঁড়া থাকা সত্ত্বেও দেহটা যেমন শক্ত খোলা দিয়ে ঢাকা থাকে, ঠিক যেন গ্রীক নাইট. এখনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নামবে।

সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, ১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্টীট, কলিকাতা।

● মজার ছবি। —প্রনব হোড়

কলকাতার যাদুঘরে মিশরের মমি

শ্রীউৎপল হোম রায়

ফোটো : কল্যাণ চক্রবর্তী

কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে যারা গেছ—তারা নিশ্চয়ই মমিটিকে দেখছ। এটি একটি মৃত পুরুষের মমি। মমিটিকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগেকার বলে বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন। সম্প্রতি এক এক্স-রে পরীক্ষায় জানা গেছে যে লোকটির মৃত্যু হয়েছিল পাঁজরে কোন ভারী বস্তুর আঘাতের ফলে। মৃত্যুকালে লোকটির বয়েস হয়েছিল পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের মতো। লোকটি ঐ সময় এক ধরনের স্পনডেলাইটিজ্ রোগে ভুগছিল। তার হাঁটুতেও বাত হয়েছিল ফলে কিছুটা পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।

মিশরের সব চাইতে পুরোন মমিটির আবিষ্কর্তা হলেন মিঃ ওয়ালটেয়ার এমেরি। তিনি এটি ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে যে সমাধিক্ষেত্র থেকে আবিষ্কার করেন তা ৩,২০০ খৃস্টাব্দ পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। বর্তমান কালে পৃথিবীর কোনও দেশেই আর মমি করার প্রথার প্রচলন নেই।

মিশরীয়রা কি ভাবে মৃত মানুষের দেহকে মমিতে পরিণত করতেন তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। সাধারণত কালো পিচ্ জাতীয় পদার্থের সঙ্গে এলাচ ও লংকা গুড়ো প্রভৃতি মশলা এবং গঁদ মিশিয়ে এক ধরনের ঘন জলীয় পদার্থে মৃত দেহটিকে ক্রমান্বয়ে সত্তর দিন সম্পূর্ণ ডুবিয়ে রেখে তারপর শন জাতীয় কাপড়ে জড়িয়ে নেওয়া হতো। আবার অনেক সময় বিশেষ এক শ্রেণী লোককে সত্তর দিন মধুতে ডুবিয়ে রেখে পরে শন জাতীয় কাপড়ে অতি সন্তর্পণে জড়িয়ে নেওয়া হতো। তারপর মৃতদেহটির আকৃতি অনুযায়ী দু' প্রস্ত পাইন কাঠের অথবা কাগজের তৈরী মণ্ডে প্রস্তুত আবরণের মধ্যে দেহটিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। আবরণটির ভেতরের দিকটা মসৃণ এবং বাইরের দিকটি কারুকার্য খচিত থাকতো। অনেক সময় বাইরের দিকটিতে মৃতের জীবনী অথবা বীরত্ব গাথা খোদাই করে দেওয়া হতো। আবার অনেক সময় মৃত মানুষটির ছাঁচে তৈরী নাক মুখ চোখ হাত পা সব জুড়ে দেওয়া হতো।

তারপর ওটিকে চূর্ণ পাথরের চাঁই সাজানো কফিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। এভাবে হাজার হাজার বছর পাথরের তৈরী, বিরাট বিরাট পিরামিড অথবা ফিংস-এর মতো সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে মমিগুলোর অস্তিত্ব টিকে থাকতো।

মিশরের সব চাইতে বড় পিরামিডটি উচ্চতায় হলো ৪৮২ ফুট এবং সাধারণতঃ ফিংসগুলি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ২৪০ ফুট। ফিংসগুলি হলো পৃথিবীর সব চাইতে বৃহত্তম মূর্তি এবং এর সামনের দিকের দুটি থাবা থেকে পেছনের লেজ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ২৪০ ফুট।

পৃথিবীর বিভিন্ন যাদুঘরের মধ্যে লণ্ডনের বৃটীশ যাদুঘরে এবং কায়রোর যাদুঘরেই বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত মমিগুলি সাজিয়ে রাখা রয়েছে। আর শুধু মাত্র একটি মমি স্থান পেয়েছে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে। এটা কি করে সম্ভব হলো, সে কথাই তোমাদের কাছে এখন বলছি।

মিশরের বিখ্যাত সম্রাট মেন-কাউ-রা-এর মমিটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর জাহাজে করে যখন লণ্ডনের যাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল—তখন এক সামুদ্রিক ঝড়ে মমিটি চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়।

চেষ্টা করেও মমিটির আর কোনও হদিশ মেলে না।

এমনি করে জাহাজে মমি পাঠানোর কালে এক সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজ পথ হারিয়ে বোম্বের দরিয়ায় এসে কূল পেয়ে সেখানেই কলকাতার যাদুঘরের এই মমিটিকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটে ১৮৩৪ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে কোনও এক সময়ে। পরে এটি বেঙ্গল লাইট ক্যাভেলরির লেফট্যানান্ট ই. সি. আর্চডোভের হাতে আসে।

তিনি ১৮৩৪ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে এ মমিটিকে এশিয়াটিক্ সোসাইটিকে দান করেন। পরে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘর মমিটিকে এশিয়াটিক্ সোসাইটির কাছ থেকে সংগ্রহ করে।

সেই থেকে সুদূর মিশরের ছয় হাজার বছর আগেকার মমিটি শিশু-বুড়ো সকলের দর্শনীয় বস্তু হিসেবে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে স্থান করে নিয়েছে।

আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী—চাঁদ

বিমান বসু

পৃথিবীর এক মাত্র উপগ্রহ চাঁদ। প্লুটোকে বাদ দিলে সৌরমণ্ডলের আর কোনও গ্রহের (যাদের উপগ্রহ আছে) উপগ্রহ সংখ্যা এত কম নয়। তবে একমাত্র হলে কি হবে, আমাদের চাঁদ যেন একাই একশ'। এর দুটো কারণ আছে। প্রথমতঃ, মহাকাশে চাঁদ হলো পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী। পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব হলো মাত্র ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার কিলোমিটার (সে তুলনায় পৃথিবী থেকে নিকটতম গ্রহ শুক্রের দূরত্ব ৪ কোটি ১ লক্ষ কিলোমিটার)।

চাঁদের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো এর বিশাল আকার। মূল গ্রহের তুলনায় এত বড় উপগ্রহ আমাদের সৌরমণ্ডলে আর নেই। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। সৌরমণ্ডলে বিভিন্ন গ্রহের মত উপগ্রহ আছে মূল গ্রহের তুলনায় তাদের আয়তন খুবই ছোট। যেমন ধরো, সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হলো শনির 'টাইটান্'। টাইটানের ব্যাস প্রায় ৬০০০ কিলোমিটার, মানে আমাদের চাঁদের প্রায় দেড় গুণ। কিন্তু সে তুলনায় শনির ব্যাস হলো ১,২০,০০০ কিলোমিটার। সুতরাং টাইটান্ নিজে বিশাল হলেও, শনির তুলনায় সে খুবই ছোট। শনির যা আয়তন তার মধ্যে ৮০০০টি টাইটান পুরে রাখা যায়। সৌর-মণ্ডলের অন্যান্য গ্রহের বেলায়ও দেখা গেছে যে তাদের উপগ্রহের ব্যাস মূল গ্রহের ব্যাসের ১০ ভাগের এক ভাগ বা তারও কম। কিন্তু আমাদের চাঁদের বেলায় ব্যাপারটা অন্য রকম। পৃথিবীর ব্যাস হলো ১২,৭৫৬ কিলোমিটার। সে তুলনায় চাঁদের ব্যাস ৩৪৮০ কিলোমিটার। মানে পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ৪ ভাগের এক ভাগ। আমাদের পৃথিবীর যা আয়তন তার মধ্যে মাত্র পঞ্চাশটা চাঁদ পুরে রাখা যায়।

এত বড় আর এত কাছে হওয়ার দরুন পৃথিবীর ওপর যে চাঁদের প্রভাব খুব বেশী হবে সেটা স্বাভাবিক। যেমন ধরো চাঁদের আলো। পূর্ণিমার রাতে ধব্‌ধবে জ্যোৎস্নার আলো আমরা পাই কেবলমাত্র চাঁদ অত বড় আর অত কাছে আছে বলে। এছাড়া পৃথিবীতে জোয়ার ভাটার প্রধান কারণও হলো চাঁদের টান। আবার এই টানের ফলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসছে যার ফলে দিনের দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। অবশ্য এই বৃদ্ধির হার খুবই সামান্য—প্রতি একশো বছরে পৃথিবীর দিন বড় হচ্ছে এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র।

তবে এ সবের থেকেও বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলো চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের। আদিম সভ্যতার যুগ থেকেই চাঁদ মানুষকে আকৃষ্ট করছে। মানুষ দেখে আসছে চাঁদের নিয়মিত বাড়া-কমা-বা 'কলা'। শোনা যায় ঐ কলা দেখেই অতীতের মানুষ প্রথম ক্যালেণ্ডার তৈরীর কথা ভেবেছিল। আজও বহুদেশে চান্দ্র মাস নিয়মিত ক্যালেণ্ডারে ব্যবহার হয়। আমাদের ক্যালেণ্ডারে পূর্ণিমা অমাবস্যা প্রতিপদ ইত্যাদি যে সব তিথি থাকে তার মূলেও আছে চাঁদের ঐ কলা। এমনকি আমাদের পূজা-পার্বণ. এবং বিভিন্ন উৎসবাদির তারিখও নির্ধারণ করা হয় চাঁদের কলার ভিত্তিতে।

চাঁদের এই যে দৈনন্দিন বাড়া-কমা, এটা কিন্তু আসলে আমাদের চোখের ভ্রম। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে চাঁদের নিজস্ব কোনও আলো নেই। চাঁদকে আমরা দেখতে পাই সূর্যের প্রতিফলিত আলোয়। কিন্তু যেহেতু চাঁদ পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে, সেজন্য চাঁদের পুরো আলোকিত অংশ সব সময় পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। কতটা আলোকিত অংশ দেখা যাবে তা নির্ভর করে পৃথিবী, চাঁদ এবং সূর্যের পারস্পারিক অবস্থানের উপর। চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে থাকে (মানে, আকাশে চাঁদ ও সূর্যের ব্যবধান যখন শূন্য ডিগ্রী), তখন চাঁদের আলোকিত অংশ থাকে চাঁদের যেদিকে পৃথিবী তার উল্টোদিকে। মানে, তখন পৃথিবী থেকে চাঁদকে দেখাই যায় না। একেই আমরা অমাবস্যা বলি।

অমাবস্যার দু এক দিন পর কাস্তের মত ফালি চাঁদকে দেখা যায় পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের ঠিক পরে। সে সময় আকাশে সূর্য ও চাঁদের ব্যবধান ২০ বা ২৫ ডিগ্রী। এই ভাবে ক্রমাগত সরতে সরতে অমাবস্যার প্রায় ৭ দিন পর চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য প্রায় এক সমকোণে এসে পৌঁছয়।

আকাশে চাঁদ ও সূর্যের মধ্যে ব্যবধান তখন ৯০ ডিগ্রী, চাঁদের আলোকিত অংশের আধখানা আমরা এ সময় দেখতে পাই, আর এই আধখানা চাঁদকে সূর্যাস্তের সময় দেখতে পাওয়া যায় আকাশে ঠিক মাথার ওপরে। এর আরও সাতদিন পর চাঁদ গিয়ে পৌঁছয় পৃথিবীর যে দিকে সূর্য তার উল্টো দিকে। তখন পৃথিবী থাকে চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে। আকাশে চাঁদ ও সূর্যের মধ্যে ব্যবধান এখন হয়ে দাঁড়ায় ১৮০ ডিগ্রী। এ সময় চাঁদের পুরো আলোকিত অংশটাই পৃথিবী থেকে দেখতে পাওয়া যায়। এই হলো আমাদের পূর্ণিমা।

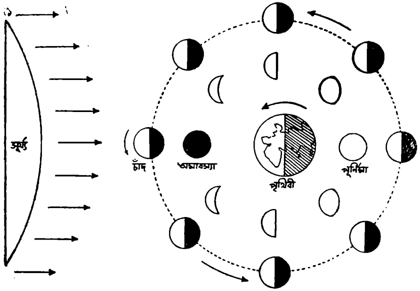

১। চাঁদের কলা।

পূর্ণিমার পর চাঁদের আলোকিত অংশ আবার ছোট হতে থাকে। পূর্ণিমার সাত দিন পর আবার আধখানা চাঁদ আকাশে দেখা যায়। তবে এ সময় চাঁদ ওঠে মধ্য-রাত্রির পর আর সূর্যোদয়ের সময় সে থাকে ঠিক মাথার ওপর। এরও দিন পাঁচেক পর আবার কাস্তে চাঁদ, তবে এবারে তাকে দেখা যায় ভোরে সূর্যোদয়ের ঠিক আগে পূব আকাশে। তারপর আবার আসে অমাবস্যা। এইভাবে প্রতি মাসে চলে আকাশে চাঁদের বাড়াকমার চক্র। অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, তারপর আবার অমাবস্যা, তারপর আবার আসে পূর্ণিমা।

পৃথিবী থেকে চাঁদের কলা ছাড়াও আরও একটা বিশেষ জিনিস চোখে পড়ে। তা হলো চাঁদের গায়ে অস্পষ্ট দাগ বা কলঙ্ক। ঐ দাগ কিন্তু আসলে চাঁদের ওপর পাহাড়, গহ্বর আর সমতলভূমি যা দূরবীনে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা যদি প্রতিদিন চাঁদের গায়ের ঐ দাগের দিকে লক্ষ্য রাখো তাহলে দেখবে চাঁদের একটাই দিক সব সময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। তোমরা হয়তো ভাবছো যে তাহলে কি চাঁদ পৃথিবীর মতো নিজের অক্ষে ঘুরছে না? ঘুরছে তবে সেই ঘোরার একটা বিশেষত্ব আছে। পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরতে চাঁদের যে সময় লাগে (২৭ ১/৩ দিন), নিজের অক্ষে একবার পাক খেতেও তার ঠিক একই সময় লাগে। এই আশ্চর্য সমন্বয়ের জন্যই আমরা কেবল একটাই দিক পৃথিবী থেকে দেখতে পাই তবে একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে। তা হলো এই যে পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরতে চাঁদের ২৭⅓ দিন লাগে বটে, কিন্তু এক অমবস্যা থেকে পরের অমাবস্যা কিংবা এক পূর্ণিমা থেকে পরবর্তী পূর্ণিমায় আসতে সময় লাগে একটু বেশী, প্রায় ২৯½ দিন, যাকে বলা হয় 'চান্দ্র মাস'। এটা হয় কক্ষপথে পৃথিবীর গতির দরুন যার ফলে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদের আসতে, বা সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে পৃথিবীর আসতে প্রায় ২ দিন বেশী সময় লাগে।

পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের ঘোরার আরও একটা বিশেষত্ব আছে। আগেই বলেছি যে উপগ্রহ হিসেবে চাঁদের আকার খুবই বড়। এত বড় হওয়ার দরুন পৃথিবী যেমন চাঁদকে টানে, চাঁদও তেমনি পৃথিবীকে টানে। এই দুপক্ষের

টানাটানির ফলে আসলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, শুধু যে চাঁদই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে তা নয়, বরং পৃথিবী ও চাঁদ দুজনে দুজনের চারিদিকে ঘুরে চলেছে।

ছোট দূরবীনে চাঁদের গায়ে কালো দাগ দেখে আগেকার কালের বিজ্ঞানীরা মনে করতেন সেগুলি চাঁদের সমুদ্র। এই ধারণা অনুযায়ী সেগুলির নামকরণও করেছিলেন তাঁরা। যেমন শান্ত সাগর (Sea of Tranqullity), স্নিগ্ধ সাগর (Sea of Serenity) অমৃত সাগর (Sea of Nectar), বর্ষণ সাগর (Sea of Rains) ইত্যাদি। পরে শক্তিশালী দূরবীনে দেখা গেল চাঁদে মোটেই জল নেই, সুতরাং সমুদ্রও নেই। কিন্তু নামগুলো রয়েই গেছে। আজ আমরা জানি যে চাঁদের ওপরের যে এলাকাকে আগে সাগর মনে করা হয়েছিল আসলে তা হলো বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি যেখানে অতীতে কোনও সময় চাঁদের ভেতর থেকে লাভাজাতীয় পদার্থ বেরিয়ে এসে জমাট বেঁধে গেছে। চাঁদের ঐ সমতল ভূমি কিন্তু সম্পূর্ণ সমতল নয়। সেখানে অসংখ্য জ্বালামুখ বা খাদ, ছোট ছোট ঢিবি, সরু লম্বা আঁকাবাঁকা ফাটল ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে।

চাঁদের যে দিকটা আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই তার বেশীর ভাগটাই হলো এবড়ো খেবড়ো—বিশাল বিশাল পর্বতশ্রেণী আর উঁচু দেওয়াল ঘেরা গহ্বরে ভরা। পৃথিবীর মত চাঁদের পর্বতশ্রেণীগুলিরও নাম দেওয়া হয়েছে আলপ্‌স্‌, ককেসাস্‌ ইত্যাদি। চাঁদের সবচেয়ে উঁচু পর্বত শৃঙ্গ 'মাউন্ট লাইব্‌নিৎস্‌', এর উচ্চতা প্রায় ৭৯০০ মিটার।

চাঁদের উপরিতলে সবচেয়ে বেশী করে যে জিনিসটা চোখে পড়ে তা হলো ছোট বড় নানা সাইজের অসংখ্য গহ্বর। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছোট—১০, ২০ বা ৩০ কিলোমিটার ব্যাসের। আবার একশো বা দু'শো কিলোমিটার ব্যাসের বিশাল গহ্বরও আছে। চাঁদের গহ্বরগুলো কিন্তু খুব বেশী গভীর নয়, তাদের বেশীর ভাগই বরং উঁচু দেওয়াল ঘেরা ঢালু জমির মত। গহ্বরগুলোর নাম রাখা হয়েছে অতীতের বিখ্যাত লোকের নামে, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নামে, যেমন টলেমী, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেল ইত্যাদি। কয়েক বছর আগে বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডঃ বিক্রম সারাভাই-এর নামেও চাঁদের একটি গহ্বরের নাম রাখা হয়েছে। এছাড়া, চাঁদের উল্টোদিকের তিনটি গহ্বরের নাম আগেই তিনজন ভারতীয় বিজ্ঞানী, জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা এবং হোমী ভাবার নামে রাখা হয়েছিল। চাঁদের সব চেয়ে বড় গহ্বরের নাম ক্লেভিয়াস্‌; এর ব্যাস ২৩০ কিলোমিটার।

এখন তোমরা হয়ত প্রশ্ন করবে, চাঁদের ওপর এত গহ্বর এলো কোথা থেকে? এ নিয়ে অনেক মত আছে। তবে আধুনিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে মাত্র দুটি মত ঠিক বলে মনে হয়। একটি মত অনুসারে, গহ্বরগুলো তৈরি হয়েছে আগ্নেয়গিরির ক্রিয়ার ফলে, যেমন পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মত হলো এই যে, গহ্বরগুলো তৈরি হয়েছে উল্কাপাতের ফলে। চাঁদে হাওয়া নেই, সুতরাং উল্কাপিণ্ড যখন চাঁদের মাটির দিকে নেমে আসে, তখন তার গতিবেগও কমে না আর তা পুড়েও যায় না। ফলে ছোট বড় সব আকারের উল্কাপিণ্ডই প্রচণ্ড বেগে চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়তে পারে যার ফলে গহ্বরের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতেও বহু জায়গায় উল্কাপিণ্ডের আঘাতে তৈরী গহ্বর আছে, তবে বেশীর ভাগই হয়ত আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমাদের দেশে রাজস্থানের লোনার হ্রদও ঐ ভাবেই তৈরী হয়েছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

চাঁদের এত বেশী সংখ্যক গহ্বরের আরও একটা কারণ হলো সেখানে বায়ুমণ্ডলের অভাব। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে পৃথিবীর ওপর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন ক্রিয়ার ফলে এ ধরনের প্রাকৃতিক চিহ্ন সহজেই ধুয়ে মুছে যায়। কিন্তু চাঁদে তা হতে পারে না কারণ সেখানে হাওয়া নেই, ঝড় বৃষ্টিও নেই। আর সেজন্য চাঁদের মাটিতে ছোটখাট দাগও প্রায় চিরস্থায়ী হয়ে যায়। গত দশকে চাঁদের ওপর ১২ জন মানুষ নেমে চলে ফিরে বেড়িয়েছে। তারা গাড়িও চালিয়েছে চাঁদের মাটিতে। এর ফলে তারা চাঁদের মাটিতে রেখে এসেছে অসংখ্য জুতোর ছাপ আর গাড়ির চাকার দাগ। ঐ সব দাগও আজ থেকে হাজার হাজার বছর বাদে ঠিক একই রকম থাকবে।

চাঁদের ওপর বায়ুমণ্ডল না থাকার দরুন সেখানের আকাশ যে কেমন হবে তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ। হ্যাঁ, এর ফলে দিনের বেলাতেও চাঁদের আকাশ কুচকুচে কালো। আর শুধু তাই নয়, সেই কালো আকাশে দিনের বেলাতেও চকচক করে অসংখ্য তারা।

আর একটা কথা আছে। পৃথিবীর আকাশে আমরা যেমন চাঁদকে দেখতে পাই, চাঁদের আকাশেও তেমনি পৃথিবীকে দেখা যায়। তবে তা দেখায় মস্ত একটা থালার মত, চাঁদের চেয়ে প্রায় আড়াই গুণ বড়। শুধু তাই নয়। চাঁদের তুলনায় পৃথিবীর আলো প্রতিফলন ক্ষমতাও অনেক বেশী বলে চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে যে

শুধু বড়ই দেখায় তা নয়, অনেক বেশী জ্বলজ্বলেও দেখায়। হিসেব করে দেখা গেছে যে চাঁদের আকাশে পৃথিবীর পুরো আলোকিত অংশটা যখন দেখা যায় তখন তার আলো পৃথিবীতে পূর্ণিমার চাঁদের আলোর তুলনায় প্রায় ৩০ গুণ বেশী।

আগে বলেছি, চাঁদের একটাই দিক পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। এর ফলে বেশ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়। চাঁদের আকাশে পৃথিবী উদয়ও হয় না, অস্তও যায় না। চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে স্থির মনে হয়।

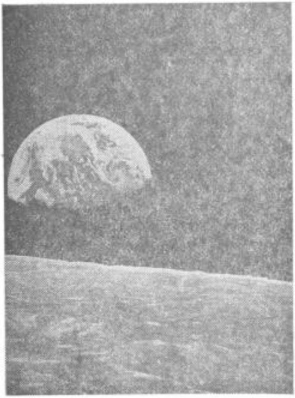

২। চাঁদের আকাশে পৃথিবী। চন্দ্রযান থেকে তোলা ছবি।

তবে আকাশের কোন জায়গায় তাকে দেখা যাবে তা নির্ভর করে চাঁদের কোন জায়গা থেকে দেখা হচ্ছে তার ওপর। চাঁদের যেখান থেকে পৃথিবীকে দিগন্তের ওপর দেখা যায় সেখান থেকে বরাবরই তাকে সেই জায়গাতেই দেখা যাবে। আবার যেখানে পৃথিবী থাকে মাথার ওপর সেখান থেকে বরাবরই তাকে মাথার ওপরেই দেখা যাবে।

চাঁদের কলার মত চাঁদের আকাশেও পৃথিবীর কলা দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এখানে গোটা ব্যাপারটাই উল্টোভাবে ঘটে। পৃথিবীতে যখন পূর্ণিমা (আমরা পূর্ণ-পৃথিবীও বলতে পারি); চাঁদে তখন অমাবস্যা। পৃথিবীতে যখন চন্দ্রগ্রহণ, চাঁদে তখন সূর্যগ্রহণ; পৃথিবীতে যখন সূর্যগ্রহণ, চাঁদে তখন দেখা যাবে 'পৃথিবী গ্রহণ'। অবশ্য এখানে পুরো পৃথিবীটাই অন্ধকার হয়ে যায় না, কেবলমাত্র চাঁদের ছায়াকে পৃথিবীর ওপর দিয়ে দ্রুত বেগে সরে যেতে দেখা যায়।

পৃথিবীতে সূর্যগ্রহণের সময় একটা জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ—আকাশে সূর্য ও চাঁদের সাইজ একই মনে হয়। আসলে কিন্তু এটাও আমাদের চোখের ভ্রম। আসলে সূর্যের ব্যাস চাঁদের ব্যাসের চেয়ে চারশো গুণ বেশী। তারা একই সাইজের দেখায়, কারণ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বও হলো পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের চারশো গুণ বেশী। অবশ্য চাঁদের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হওয়ার দরুন কখনও কখনও চাঁদের দূরত্ব একটু বেশী হয়ে পড়ে। সে সময় চাঁদকে সূর্যের চেয়ে একটু ছোট দেখায়। ঐ সময় যদি সূর্যগ্রহণ হয় তবে তা কেবল 'বলয় গ্রাস'ই হতে পারে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। তোমরা জানো যে সূর্যগ্রহণ কেবলমাত্র অমাবস্যাতেই হয়, আর চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে কেবলমাত্র পূর্ণিমাতেই। এখন প্রশ্ন হলো প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতেই গ্রহণ হয় না কেন? এর কারণ হলো এই যে চাঁদের কক্ষতল আর পৃথিবীর কক্ষতল এক সমতলে নেই, আছে ৫ ডিগ্রী কোনাকুনি ভাবে। এই কোনাকুনি থাকার ফলেই পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য একই সরলরেখায় আসতে পারে না, সুতরাং গ্রহণও হয় না।

আগেই বলেছি, চাঁদ নিজের অক্ষে একবার পাক খায় ২৯½ দিনে। সুতরাং চাঁদের এক দিন হলো, পৃথিবীর প্রায় একমাসের সমান। তার মধ্যে 'দিন' প্রায় ১৫দিনের সমান, 'রাত' ১৫দিনের সমান। বুঝতেই পারছ, ক্রমাগত ১৫ দিন সূর্যের প্রখর তেজে থাকার দরুন চাঁদের ওপর দিনের বেলার তাপমান খুব বেশী হবে। দেখা গেছে, চাঁদে যখন দুপুর সে সময় সেখানকার তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসেরও বেশী। মানে, তখন সেখানে ফুটন্ত জলের থেকেও বেশী গরম। আবার চাঁদের মাঝ-রাত্তিরে ঐ তাপমান নেমে আসে শূন্যেরও ১১৬ ডিগ্রী নিচে। তাপমানের এত বেশী ওঠানামার কারণও হলো চাঁদের ওপর বায়ুমণ্ডলের অভাব।

চাঁদের ওপর বায়ুমণ্ডল কেন নেই এবার সে কথা

যে সব মানুষ চাঁদে গিয়েছেন

	চন্দ্রযান	চাঁদের কক্ষে ছিলেন	চাঁদের ওপর নেমেছেন
১।	অ্যাপোলো-১১	মাইকেল কলিনস্	নীল আর্মস্ট্রং এবং এড্‌উইন অ্যালড্রিন।
২।	অ্যাপোলো-১২	রিচার্ড এফ গর্ডন	চার্লস্ করব্যাড্ এবং অ্যালান এল বীন।
৩।	অ্যাপোলো-১৪	স্টুয়ার্ট এ রুজা	অ্যালান বি শেপার্ড এবং এডগার বি মিচেল।
৪।	অ্যাপোলো-১৫	আলফ্রেড বি ওয়ার্ডেন	ডেভিড আর স্কট এবং জেমস বি আরউইন।
৫।	অ্যাপোলো-১৬	টমাস কে ম্যাটিংলে	জন ডবল্ ইয়ং এবং চার্লস এম ডিউক।
৬।	অ্যাপোলো-১৭	রোনাল্ড ই ইভানস্	ইউজিন এ সেরনান এবং হ্যারিসন এইচ স্মিট।

চন্দ্র অভিযানের নির্ঘণ্ট

	চন্দ্রযান	যাত্রা শুরু		চন্দ্রযান	যাত্রা শুরু
১।	ল্যুনিক-১	২রা জানুয়ারী ১৯৫৯	২৪।	সার্ভেয়র-৬	৭ নভেম্বর " ৬৭
২।	ল্যুনিক-২	১২ সেপ্টেম্বরণ ১৯৫৯	২৫।	সার্ভেয়র-৭	৭ জানুয়ারী " ৬৮
৩।	ল্যুনিক-৩	৪ অক্টোবর ১৯৫৯	২৬।	জোন্দ-৫	১৫ সেপ্টেম্বর " ৬৮
৪।	ল্যুনা-৭	২ এপ্রিল ১৯৬৩	২৭।	জোন্দ-৬	১০ নভেম্বর " ৬৮
৫।	রেঞ্জার-৭	২৮ জুলাই ১৯৬৫	২৮।	অ্যাপেলো-৮	২১ ডিসেম্বর " ৬৮
৬।	ল্যুনা-৫	১৯৬৫	২৯।	অ্যাপোলো-১০	১৮ মে " ৬৯
৭।	ল্যুনা-৬	১৯৬৫	৩০।	অ্যাপেলো-১১	১৬ জুলাই " ৬৯
৮।	ল্যুনা-৭	১৯৬৫	৩১।	অ্যাপেলো-১২	১৪ নভেম্বর " ৬৯
৯।	ল্যুনা-৮	১৯৬৫	৩২।	অ্যাপেলো-১৩	১১ এপ্রিল " ৭০
১০।	রেঞ্জার-৮	১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫	৩৩।	ল্যুনা-১৬	১২ সেপ্টেম্বর " ৭০
১১।	রেঞ্জার-৯	২১ মার্চ ১৯৬৫	৩৪।	জোন্দ-৮	২০ অক্টোবর " ৭০
১২।	ল্যুনা-৯	৩১ জানুয়ারী ১৯৬৬	৩৫।	ল্যুনা-১৭	১১ নভেম্বর " ৭০
১৩।	ল্যুনা-১০	৩১ মার্চ " ৬৬	৩৬।	অ্যাপোলো-১৪	৩১ জানুয়ারী " ৭১
১৪।	সার্ভেয়র-১	৩০ মে " ৬৬	৩৭।	অ্যাপোলো-১৫	২৬ জুলাই " ৭১
১৫।	ল্যুনার অরবিটার-১	১০ আগষ্ট " ৬৬	৩৮।	ল্যুনা-১৮	২ সেপ্টেম্বর " ৭১
১৬।	ল্যুনা-১২	২২ অক্টোবর " ৬৬	৩৯।	ল্যুনা-১৯	২৮ সেপ্টেম্বর " ৭১
১৭।	ল্যুনা অরবিটার-২	৬ নভেম্বর " ৬৬	৪০।	ল্যুনা-২০	১৪ ফেব্রুয়ারী " ৭২
১৮।	ল্যুনা-১৩	২১-ডিসেম্বর " ৬৬	৪১।	অ্যাপোলো-১৬	১৬ এপ্রিল " ৭২
১৯।	ল্যুনার অরবিটার-৩	৫ ফেব্রুয়ারী " ৬৭	৪২।	অ্যাপোলো-১৭	৭ ডিসেম্বর " ৭২
২০।	সার্ভেয়র-৩	১৯জুলাই " ৬৭	৪৩।	ল্যুনা-২১	৮ জানুয়ারী " ৭৩
২১।	এক্সপ্লোরার-৩৫	১৭ এপ্রিল " ৬৭	৪৪।	ল্যুনা-২২	২৮ মে " ৭৪
২২।	ল্যুনার অরবিটার-৫৪	১ আগস্ট " ৬৭	৪৫।	ল্যুনা-২৩	২৮ অক্টোবর " ৭৪
২৩।	সার্ভেয়র-৫	৮ সেপ্টেম্বর " ৬৭	৪৬।	ল্যুনা-২৪	৯ আগষ্ট " ৭৬

তোমাদের বলি। আগেই বলেছি যে চাঁদের আয়তন পৃথিবীর ৫০ ভাগের এক ভাগ। এছাড়া ঘনত্বও পৃথিবীর তুলনায় কম। পৃথিবীর ঘনত্ব হলো ৫·৫, সে তুলনায় চাঁদের ঘনত্ব ৩.৩। সব মিলিয়ে চাঁদের ভর হলো পৃথিবীর তুলনায় ৮১ ভাগের এক ভাগ মাত্র। ভর কম হওয়ার দরুন চাঁদের মহাকর্ষ শক্তিও কম, পৃথিবীর অভিকর্ষের দু'ভাগের এক ভাগ মাত্র। তার মানে, পৃথিবীতে যে মানুষের ওজন ৯০ কিলোগ্রাম, চাঁদে তার ওজন হবে মাত্র ১৫ কিলোগ্রাম। এর আর একটা দিক আছে। পৃথিবীর অভিকর্ষকে কাটিয়ে বেরোতে হলে রকেট ইত্যাদির গতি কমপক্ষে ১১.২ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে হওয়া অনিবার্য। কিন্তু চাঁদের টান কাটিয়ে বেরোবার জন্য ২.৫ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ড গতিবেগই যথেষ্ট। এত কম 'প্রস্থান বেগ' হওয়ার দরুনই চাঁদের নিজস্ব বায়ুমণ্ডলকে টেনে রাখবার ক্ষমতা নেই। যদি অতীতে কখনও চাঁদের বায়ুমণ্ডল থেকেও থাকে তা সম্ভবতঃ মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে।

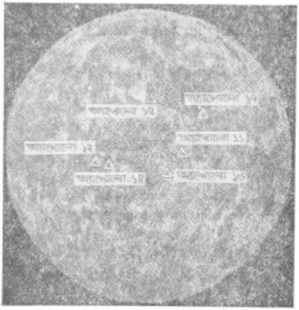

চাঁদের যে সব এলাকায় মানুষ নেমেছে।

চাঁদ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ১৯৫৯ সালে। সে বছর অক্টোবর মাসে একটি সোভিয়েত মহাকাশযান, ল্যুনিক-৩ চাঁদের পরিক্রমা করে তার উল্টো-দিকের ছবি তুলে পাঠায়। ঐ সব ছবিতে দেখা যায় যে চাঁদের ঐ দিকটাও প্রায় সামনের দিকের মতই দেখতে এবড়ো খেবড়ো, গহ্বরে ভরা।

ল্যুনিক-৩ এর পর এ পর্যন্ত সবে মিলিয়ে প্রায় ৫০টি মহাকাশযান চাঁদ অভিমুখে পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল মানুষ ছাড়া অনুসন্ধানী যান, যেগুলি কাছ থেকে চাঁদের ছবি তুলে পাঠায়। কিছু আবার চাঁদের উপর নেমে সেখান থেকে ছবি ও অন্যান্য তথ্য পাঠায়। তারপর, ১৯৬৯ সালে ২১ শে জুলাই ঘটে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐ দিন পৃথিবীর মানুষ প্রথম চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করে।

৪। চাঁদের ওপর প্রথম মানুষ। নীল আর্মস্ট্রং-এর তোলা এড্‌উইন অ্যালড্রিন-এর ছবি।

মার্কিন চন্দ্রযান অ্যাপোলো-১১ তে চড়ে সেদিন চাঁদের মাটিতে নেমেছিলেন দুজন মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং ও এড্‌উইন অ্যালড্রিন। অ্যাপোলো ১১-র পর আরও পাঁচটি অ্যাপোলো চন্দ্রযান মানুষ নিয়ে চাঁদের বুকে বিভিন্ন অঞ্চলে নামে। সব মিলে মোট ১২ জন মহাকাশচারী চাঁদের মাটিতে নেমে সেখানে নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এসেছেন। তাঁরা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন

প্রচুর বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং চাঁদের মাটি ও পাথর। শেষের তিনটি অভিযানে (অ্যাপোলো ১৫, ১৬ এবং ১৭) আবার মহাকাশচারীদের চাঁদের ওপর চলাফেরার সুবিধার জন্য বিশেষ ধরনের ব্যাটারি-চালিত গাড়িও নিয়ে যাওয়া হয়।

ওদিকে আমেরিকা যখন চাঁদে মানুষ পাঠাতে ব্যস্ত, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মানুষ না পাঠিয়েই চাঁদ থেকে মাটি তুলে নিয়ে এসে বিজ্ঞানের অগ্রগতির এক নতুন দৃষ্টান্ত দিলেন। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাদের বিশেষ ধরনের তৈরী ল্যনা চন্দ্রযান চাঁদের মাটিতে নেমে সেখানকার মাটি তুলে নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলো। শুধু তাই নয়, এর পর ১৯৭০-এর নভেম্বরে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা চাঁদের ওপর মানুষ ছাড়া গাড়িও চালালেন, পৃথিবী থেকে সঞ্চালন করে।

এই সব অভিযানের ফলে চাঁদের গঠনের বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য আমরা পেয়েছি যা পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ করে কখনই জানা যেত না। আজ আমরা জানতে পেরেছি যে চাঁদের ভিতরের গঠনও অনেকটা পৃথিবীর মতই। চাঁদের উপরিতলের নীচে ২৪ থেকে ৬৪ কিলোমিটার পুরু মাটি এবং পাথরের স্তর আছে যা আমাদের ভূ-ত্বকের মত। চন্দ্র ত্বকের নীচে প্রায় ৯৫০ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত আছে, গরম ভারী পাথরের স্তর বা ম্যানটেল। এখানকার তাপমান প্রায় ১৭০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ম্যানটেলের নীচে চাঁদের কেন্দ্র পর্যন্ত আছে গলিত পাথরের স্তর বা 'কোর'। অবশ্য পৃথিবীর মত চাঁদের-কোর' এ লোহা নেই। আর লোহা নেই বলেই চাঁদ হাল্কা। চাঁদের ঘনত্ব কম।

চাঁদের মাটি ও পাথর বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সেগুলির রাসায়নিক গঠন পৃথিবীর মাটির মত নয়। যেমন ধরো চাঁদের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, টাইটানিয়াম ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এগুলির মাত্রা পৃথিবীতে খুবই কম। আবার চাঁদে কার্বন, লোহা ইত্যাদির মাত্রা খুবই কম। চাঁদে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এটাও জানতে পারা গেছে যে অতীতে কোনও সময় চাঁদে প্রচুর অগ্ন্যুপাত ঘটেছে যার ফলে আজ সেখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লাভার স্তর দেখতে পাওয়া যায়।

গত দশ বারো বছরে চাঁদের বিষয় অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু এখনও অনেক কিছু জানবার আছে। যেমন ধরো, আজও আমরা সঠিক জানি না যে আমাদের চাঁদ এলো কোথা থেকে। এ নিয়ে নানা মত আছে, তবে বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। হয়ত ভবিষ্যতে এ রহস্যের সমাধান পাওয়া যাবে। (ক্রমশঃ)

৭ ইউ, এফ্ কলেজ রোড, নিউদিল্লী ১।

কু-ই-জ

রমেন রায়

"কিউ-ইউ-আই-জেড"।...বড় মজাদার কাণ্ড। কথাটা কে অমন করে দেওয়ালে, জানালায় লিখে রাখলেন? শহরের লোকেরা ভাবছেন—যতদূর মনে পড়ে গতকাল রাতে তাঁরা যতক্ষণ বাইরে ছিলেন, রাস্তায় চলা-ফেরা করেছেন লেখাটা তো তারা দেখতে পান নি। পাবেন কি করে? লেখাটা কি তখন ছিল নাকি?

তা হলে এই শহরে এমন পাগল কে আছেন যে অমন করে রাতজেগে কথাটা দেওয়ালে, দরজায়, হোটেল-রেঁস্তোরার পর্দায় ঘটা করে বড় বড় হরফে লিখতে যাবেন? এমন শব্দটার অর্থ-ই বা তাহলে কি।......

একদিনেই কথাটা গোটা শহরকে ভাবিয়ে তুললো। ভাবছেন জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ব্যক্তিরা, ভাবছেন সাধারণ মানুষেরা। এ তো ভাববারই কথা। এমন একটা শব্দ যা অভিধানে নেই। অভিধানে তখনও স্থান পায় নি। অথচ ভুঁইফোড় হয়ে কথাটা দেওয়ালে দরজায় জল জল করছে। গোটা ইংলণ্ড শহরে সাড়া পড়ে গেল।......

১৭৮০ সনে ইংলণ্ডের "ডাবলিন" থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন "ডালি" সাহেব। লোকটা যেমনই আমুদে তেমনই কৌতুকপ্রিয়। কেমন করে নূতন নূতন মজাদার কাণ্ড করে লোককে পুলকিত করা যায় সেই চিন্তায়ই তিনি সর্বদা থাকতেন মশগুল। লোকটার মাথায় নানা ফন্দিও আসতো বটে।

একদিন হোল কি—বন্ধুদের সঙ্গে মজা করার জন্য বললেন—চব্বিশঘণ্টার মধ্যে তিনি একটা নূতন ইংরাজী শব্দ তৈরী করে দেবেন। এই নিয়ে ডালি সাহেব তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বাজিও রাখলেন। যেই কথা সেই কাজ। বসলেন তিনি শব্দ নিরীক্ষায়। এক একটা শব্দকে ভেঙ্গে উল্‌টে-পালটে নানাভাবে সাজিয়ে তিনি রাতভর চেষ্টা চালাতে লাগলেন।—অবশেষে তিনি পেলেন।—"কিউ-ইউ আই জেড্।" "কুইজ।" ইউরেকা—ইউরেকা। পেয়ে গেলেন তিনি।

আনন্দে দেওয়ালে দেওয়ালে শব্দটা বাকী রাতটুকু জেগে লিখেই ফেললেন। সকালে দেশের লোক দেখে তো একেবারে থ।.. আসলে তিনি কথাটা মজা করার জন্যই দেওয়ালে লিখেছিলেন। কথাটার অর্থ "মজা করা।" কেউ কেউ ধাঁধাও বলেন। এই একটিমাত্র কথা তৈরী করে ডালি সাহেব পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকলেন।

হাতখরচের টাকা ইউকোব্যাঙ্কে জমিয়েই আমি এই সাইকেল কিনেছি

বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা
সাইকেল নয়।
এটা আমার নিজেরই।
সাইকেল কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছি
যখন, বাবা বললেন, ইউকোব্যাঙ্কে জমাও,
টাকা বেড়ে যাবে তাড়াতাড়ি।
তাই করলাম।
নিজের টাকা, সুদের টাকা।
বেশিদিন লাগে নি। নিজের সাইকেলে
চড়া, বড়ো আরাম।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে,
ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

আবিষ্কারের গল্প

প্রাণিদেহের স্বাভাবিক পুনর্গঠন

সুধাংশু পাত্র

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা। ট্রেম্বলি নামে ছিলেন এক জীববিজ্ঞানী। একবার তাঁর মাথায় যেন কি সব খেয়াল চাপল। নানা জাতের ছোট ছোট প্রাণীকে ধরে আনতেন, আর সূক্ষ্ম ও ধারাল অস্ত্র দিয়ে তাদের যে কোনো একটা অঙ্গ কেটে দিয়ে কৃমি ভাবে জোড়া লাগাতে চেষ্টা করতেন অথবা নতুন করে অঙ্গ গজায় কিনা পরীক্ষা করতেন।

একবার একটি হাইড্রার উপর ট্রেম্বলি চালালেন তাঁর পরীক্ষা। কী ভেবে হাইড্রাটাকে আড়াআড়িভাবে কেটে দু'ভাগে ভাগ করে ফেললেন। তারপর তাকে জোড়া দিয়ে রেখে দিলেন উপযুক্ত পরিবেশে।

কয়েকদিন পরে ট্রেম্বলি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, হাইড্রার টুকরো দু'টি জোড়া লেগে গেছে। হাইড্রাটাকে ফেলে না দিয়ে সযত্নে সংরক্ষণ করলেন ট্রেম্বলি। শেষে যখন ঐ জোড়া দেওয়া হাইড্রা থেকে নতুন হাইড্রার জন্ম হল, তখনই বুঝতে পারলেন কাটা হাইড্রাকে সদ্য সদ্য জোড়া দিলে জোড়া লেগে যায় অথচ সেটি মরে না।

ট্রেম্বলি এই নতুন খবরটা জানালেন বিজ্ঞানী মহলে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সহজে আস্থা স্থাপন করলেন না তাঁর কথায়। জীবকে কেটে ফেললে কী পুনরায় সে বেঁচে উঠতে পারে? এর চেয়ে ট্রেম্বলি যদি বলতেন, তিনি একটা আরশোলাকে পৃথিবী পরিক্রমা করে আসতে দেখেছেন তাহলে না হয় একটু চিন্তা করার অবকাশ থাকতো।

ট্রেম্বলির কাছ থেকে এই অসম্ভব খবরটা শুনে সব বিজ্ঞানীই এক রকম ক্ষেপে এলেন। পরীক্ষাটি হাতে-নাতে করে দেখতেও কারও প্রবৃত্তি হল না। পাগলের প্রলাপ ভেবে গুটি কয়েক চোখা চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগ করে চুপচাপ বসে গেলেন। আর বেচারা ট্রেম্বলি? ঘরের বাইরে মুখ দেখানোই তার দায় হয়ে উঠল।

কতদিন কেটে গেল। ট্রেম্বলির কথাটা ততদিনে চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু বিজ্ঞান ভোলেনি সে কথা। তার রাজ্যে যেখানে যত ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ উত্থিত হোক না কেন পরম মমতা ভরে সে জোর করে আঁকড়ে রাখে। তাই পরবর্তীকালে কিছু কিছু জীববিজ্ঞানী ট্রেম্বলির পরীক্ষার প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করে পারলেন না। সেই সব বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন রেমমার নামে জনৈক জীববিদ্যা-বিশারদ। তিনি প্রথমে গুটি কয়েক হাইড্রাকে কাটলেন। তারপর নিঃসন্দেহ হয়ে, হাইড্রা ছাড়া উক্ত সত্য অন্যান্য নিম্নস্তরের প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে গবেষণায় হলেন প্রবৃত্ত।

১৭৪১ খ্রীস্টাব্দ। বিজ্ঞান জগতে রেমমার আনলেন এক মহা-আলোড়ন। তিনি জানালেন, হাইড্রার কাটা অঙ্গ কেবল জোড়া লাগে না, এমন অনেক প্রাণী আছে—যাদের মাথাটা কেটে ফেললেও পুনরায় মাথা গজিয়ে উঠে। বিজ্ঞানীরা এবার রীতিমত চমকে উঠলেন রেমমারের কথা শুনে।

রেমমার প্ল্যানেরিয়া নামে ছোট্ট এক কৃমির উপর চালিয়ে ছিলেন তাঁর পরীক্ষা। এক সেণ্টিমিটারের কাছাকাছি লম্বা ঐ প্ল্যানেরিয়ারা—বহু জাতের হয়ে থাকে। দেখতে চ্যাপ্টা এবং রংটা ঈষৎ বাদামী।

জলাভূমিতে পাতার আড়ালে ওরা লুকিয়ে থাকে। ওদের মাথা এবং দুটি চক্ষুও আছে। কিন্তু মুখ-গহ্বরটা মাথায় নেই। পেটের ঠিক মাঝখানেই অবস্থান করছে।

রেমমার তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী একদিন ধরে আনলেন এক প্ল্যানেরিয়াকে, তারপর তার মাথাটা কেটে পুনরায় জোড়া লাগিয়ে ছেড়ে দিলেন ছোট্ট একটা জলপূর্ণ পাত্রে। পরদিন দেখলেন, প্ল্যানেরিয়াটার মাথা জোড়া লাগেনি অথচ মূল দেহটার যেখানে মাথা ছিল সেইখানটায় একটা পাতলা পর্দার মত সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণেও মরেনি প্ল্যানেরিয়াটা।

অতঃপর রেমমার সেই পাত্রেই প্রতিপালন করতে লাগলেন প্ল্যানেরিয়াটাকে। এক সপ্তাহ পরে দেখলেন যেখানে মাথা ছিল সেইখানেই গজিয়েছে ছোট্ট একটি গুটি। এবং গুটির উপর দুটি চোখ। গভীর কৌতূহল নিয়ে রেমমার রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন প্ল্যানে-রিয়াটির শেষ পরিণতি দেখার জন্যে।

মাত্র চারটে সপ্তাহও গত হল না। জলপূর্ণ পাত্রে পূর্ণাঙ্গ প্ল্যানেরিয়াটা ঘুরে বেড়াতে লাগল। শরীরে তার এতটুকু খুঁত কোথাও নেই। একেবারে সেই আগেকার

মত। কে বলবে, এর একদিন মাথা কাটা গিয়েছিস? রামায়ণের সেই রাবণ রাজা আর কি!

এখন একটা প্রশ্ন তোমাদের মনে আসতে পারে। প্ল্যানেরিয়ার ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা ঘটে, মানুষের বেলায় তা ঘটে না কেন? মাথা তো দূরের কথা, একটা আঙুল কেটে গেলেও ও আঙুল স্বাভাবিকভাবে পুনর্গঠন হয় না কেন?

সেদিন রেমমার অবশ্য এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। তবে তাঁর পরীক্ষাটি নিয়ে বহুদিন বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, প্ল্যানেরিয়ার দেহটা প্যারেনকাইমা নামে এক জাতীয় কোষ দ্বারা গঠিত। ঐ কোষেরা কিন্তু ওদের দেহে সুসংবদ্ধভাবে অবস্থান করছে না। একরকম আলতোভাবে পরস্পর ঠেকে আছে। প্যারেনকাইমা ছাড়া আর এক ধরনেরও কোষ আছে ওদের দেহে, বিজ্ঞানীরা সেই কোষগুলির নামকরণ করেছেন অবশোষিত কোষ।

অবশোষিত কোষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওরা দেখতে অনেকটা গোলাকার, এবং ওর নিউক্লিয়াসটি আনুপাতিক ভাবে বেশ বড়। একমাত্র ঐ কোষগুলিই দেহের কোন কোন অংশকে পুনর্গঠন করার ক্ষমতা রাখে। প্ল্যানেরিয়ার প্যারেনকাইমা কোষগুলি দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ না থাকায় তার অবশোষিত কোষগুলি প্যারেনকাইমা কোষগুলির ভেতর দিয়ে অক্লেশে যাতায়াত করতে পারে এবং যে অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে সেই অঙ্গ পুনর্গঠিত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

আরও মজার কথা, সব প্রাণীর ভ্রূণের মধ্যে বিজ্ঞানীরা অবশোষিত কোষের সন্ধান পেয়েছেন। তবে দেখা গেছে, উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে ঐ কোষগুলি বিশেষ বিশেষ্য অঙ্গ গঠনের জন্য ব্যয়িত হয়। প্ল্যানেরিয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যয়িত যে হয় না এমন নয়, তবে উদ্বৃত্ত থাকে যথেষ্ট সংখ্যক। আর উন্নত জীব গোষ্ঠীর বেলায় উদ্বৃত্ত থাকে না বললেও চলে। টিকটিকির লেজের দিকটা উদ্বৃত্ত অবশোষিত কোষের পরিমাণ বেশী থাকায় লেজটাই পুনর্গঠন করবার ক্ষমতা রাখে। মাথা ও পেটের দিকটায় অভাব হেতু এই দুই অংশ সম্পূর্ণ রূপে পুনর্গঠিত হয় না।

কেঁচোর ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। যখনই তার দেহের কোন অংশ কাটা যায়, তখনই দলে দলে অবশোষিত কোষ কাটা অংশের দিকে ধাবিত হয় এবং প্রথমে একটি ছোট্ট গুটি গঠন করে নেয়। তারপর সেই গুটির মধ্যেই চলতে থাকে কোষ বিভাজন। অবশেষে বিভাজনের ফলে একসময় উৎপন্ন হয় পূর্ণাঙ্গ দেহ।

বিজ্ঞানীরা আরও স্থির করেছেন, নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীদের ক্ষেত্রেই অঙ্গ পুনর্গঠনের ক্ষমতা প্রবল। তারপর ধীরে ধীরে যত উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ের প্রাণীদের পরীক্ষা করা যাবে ততই দেখা যাবে উক্ত ক্ষমতা কম হতে হতে একেবারে শূন্যে এসে গেছে।

তবে উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে যে এই ক্ষমতা একেবারে নেই এমন কথা ঠিক বলা যায় না। মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, দেহের কোন জায়গায় কেটে কিংবা ছিঁড়ে গেলে আপনা হতেই পুনর্গঠিত হয়। শরীরের অভ্যন্তরে কোনো হাড় ভেঙ্গে গেলে কিছুদিন পরে পুনরায় জোড়া লেগে যায়। নখ, চুল কাটলেও গজিয়ে উঠে। অন্যদিকে কোনো পেশী থেকে কিছুটা মাংস কেটে বার করে আনলেও পেশী পুনর্গঠন হতে দেরি হয় না। বিজ্ঞান এমন অসম্ভবকে কোনদিন সম্ভব করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে আছে যথেষ্ট সন্দেহ। তবু তোমরা বড় হলে ঐ অবশোষিত কোষগুলিকে নিয়ে ভালোভাবে গবেষণা করতে পার।

পোঃ-কালিন্দী, জেঃ-মেদিনীপুর।

খুদে বৈজ্ঞানিক/দিলীপ দাস

ঘড়ির অঙ্ক

ডঃ অসীম মুখোপাধ্যায়

আলোচ্য ঘড়ির কিছু বর্ণনা প্রয়োজন। ঘড়ির দুটি কাঁটা আছে। দৈর্ঘ্যে একটি ছোট, অপরটি বড়। প্রতি কাঁটার প্রান্ত ভাগ ঘড়ির গোলাকার ফলকের কেন্দ্রে এমন ভাবে যুক্ত যে এরা স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারে। বড় কাঁটা 60 মিনিটে পুরো ফলকটির ওপর দিয়ে সমান বেগে (কৌণিক) একবার পাক দেয় এবং ছোট কাঁটাটি অনুরূপভাবে 12 ঘণ্টায় ফলকটিকে পাক দেয়। ফলকটির পরিধিতে সম অন্তরে 60টি বিন্দু বা ঘর চিহ্নিত আছে, স্পষ্টতঃই বড় কাঁটা এক এক মিনিটে এই এক একটি ঘর অতিক্রম করে। এই ঘরের কোন একটিকে O ঘর বলে চিহ্নিত করলে, বড় কাঁটার অবস্থান দেখে সঙ্গেই কত মিনিট (প্রায়, ত্রুটির পরিমাণ <60 সেকেণ্ড) হয়েছে তা বোঝা যায়। তাই এই কাঁটাটিকে মিনিট-কাঁটা এবং এক একটি ঘরকে মিনিট-ঘর বলা হয়ে থাকে। বড় কাঁটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ছোট কাঁটাও মন্থর গতিতে ঘড়ির ফলকের ওপর দিয়ে ঘুরতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে ঘড়ির ফলকটির কিনারায় 60টি ঘর কাটা আছে; সেই 60টি ঘরের 5টি করে ঘর নিয়ে 1, 2, 3,..., 11, 12 (বা O) প্রভৃতি সংখ্যাদ্বারা দক্ষিণাবর্তে ক্রমানুসারে চিহ্নিত করলে, এই চিহ্ন বা সংখ্যাগুলি ঘণ্টা নির্দেশ করবে! স্পষ্টতঃই ছোট কাঁটা এক এক ঘণ্টায় উল্লিখিত সংখ্যাগুলি অতিক্রম করে। বলা বাহুল্য, দুটি কাঁটার ঘূর্ণনের দিক একই রকম। ছোট কাঁটার অবস্থান থেকে 12টার পর কত পুরো-ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে বোঝা যায়। সেই জন্যে ছোট কাঁটাকে ঘণ্টা-কাঁটা বললে অত্যুক্তি হবে না। দুটি কাঁটা দুরকম সময় নির্দেশ করে বলে একটি (মিনিট-কাঁটা) দৈর্ঘ্যে বড় এবং অপরটির দৈর্ঘ্য ছোট। ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া হয় রেডিওর নির্দেশিত সময়ের সঙ্গে। যদি কোন সময় দেখা যায় ছোট কাঁটা 4 এবং 5 নং দাগের অন্তর্বর্তী এবং বড় কাঁটা 37 নং ঘরে, তাহলে বুঝতে হবে সেই মুহূর্তে 4টা বেজে 37 মিনিট। কিন্তু রাত্রি না দিন? যতক্ষণ প্রকৃতি কিছু সাক্ষ্য না দিচ্ছে ততক্ষণ বোঝবার উপায় নেই রাত্রি না দিন! এই সমস্যা সহজেই সমাধান হত যদি ঘড়ির ফলকে 12টি ঘণ্টার চিহ্ন না থেকে 24টি ঘণ্টার চিহ্ন থাকত এবং ছোটকাঁটা 24 ঘণ্টায় এই ফলকটিকে একবার পাক দিত। রেলওয়ে টাইম-টেবিলে গাড়ী ছাড়ার যে সময় দেওয়া থাকে তা এই (24 ঘণ্টার) ঘড়ির সঙ্গে বুঝে নিতে সুবিধেই হত। অবশ্য ঘড়ির ফলকে এতগুলি দাগ থাকার জন্য ঘড়িটি বড়ই জেবড়া বা অপরিচ্ছন্ন দেখাত। আবার যদি দুটি ঘণ্টার দাগের মধ্যে 60টি দাগ থাকত তাহলেও বড় কাঁটার প্রয়োজনই পড়ত না, কেবলমাত্র ছোট কাঁটার অবস্থান থেকেই সময় জানা যেত। এসব মনগড়া কথা নয় বা সেই ব্যক্তির কথা নয় যাঁকে সময় জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বলতেন, নটা বেজে ..., চারটে বেজে ইত্যাদি; কত মিনিট আর বলতেন না, আসলে তাঁর ঘড়িতে বড় কাঁটাটির অভাব ছিল। বাস্তবে এমন ঘড়ি আছে যেখানে কোন কাঁটাই (প্রচলিত অর্থে) নেই, ঘড়ির ফলকের ঘূর্ণনের মাধ্যমে সময় নির্দেশিত হয়। ঘড়ির সার্থকতা সঠিক সময় নির্দেশে, তাই অনেক ঘড়িতে ঘণ্টা ও মিনিট কাঁটা ছাড়াও সেকেণ্ড নির্দেশক কাঁটাও থাকে। আবার ইলেক্‌ট্রনিকের যুগে ঘড়িতে সেকেণ্ড পর্যন্ত সময় আলোয় ফুটে ওঠে। এই নিবন্ধে যে ঘড়ির অঙ্ক কষা হবে তা আদৌ এ সব আধুনিক ঘড়ি নয়, পরন্তু দুটি কাঁটাযুক্ত মামুলী ঘড়ি। কাঁটাহীন আধুনিক ঘড়ির অঙ্ক এখনও উদ্ভাবিত হয়নি. নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে হবে।

এই নিবন্ধে h দিয়ে ঘণ্টা এবং m দিয়ে মিনিট বোঝান হবে। স্পষ্টতঃই h একটি অখণ্ড ধনাত্মক সংখ্যা যা 1 থেকে 12 (বা O) অবধি এবং m যে কোন সংখ্যা (অবশ্য বাস্তব) হতে পারে। সময় নির্দেশের ক্ষেত্রে m কে O থেকে 60-এর অন্তর্বর্তী ($0 \leq m < 60$) রাখা বাঞ্ছনীয়। মনে রাখা দরকার যে বড় কাঁটার অবস্থানের ওপর ছোট-কাঁটার অবস্থান নির্ভরশীল। h ঘণ্টা m (≥ 0) মিনিট সময়ে বড়কাঁটা m-মিনিট ঘরে অবস্থান করবে এবং ছোট-কাঁটা h থেকে (h + 1) ঘণ্টার অন্তর্বর্তী কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে থাকবে। আগেই বলা হয়েছে যে ছোটকাঁটা 12 ঘণ্টায় (অর্থাৎ 12×60 মিনিটে) 60 মিনিট-ঘর অতিক্রম করে. অতএব এক মিনিটে ছোট কাঁটা অতিক্রম করে $\frac{60}{12\times 60}=\frac{1}{12}$ মিনিট-ঘর; তাহলে m মিনিটে অতিক্রম করে $\frac{m}{12}$ মিনিট-ঘর। ঘড়িতে যখন h ঘণ্টা, ছোট কাঁটা তখন 5h মিনিট-ঘরে, কারণ ছোট কাঁটা 1 ঘণ্টায় 5 মিনিট-ঘর অতিক্রম করে।

$\therefore$ h ঘ m মি-এ ছোট কাঁটার অবস্থান $\left(5h+\frac{m}{12}\right)$ মি-ঘরে এবং বড় কাঁটার অবস্থান m মি-ঘরে। বলা

দরকার যে এই সব হিসেব 12টার দাগকে মূলবিন্দু ধরে নিয়ে করা হচ্ছে।

এই মুহূর্তে (h ঘ. m মি.) বড় কাঁটা এবং ছোট কাঁটার মধ্যে ব্যবধান হবে $\left\{\left(5h+\frac{m}{12}\right)-m\right\}$ মি-ঘর, যদি বড় কাঁটা ছোট কাঁটাকে অতিক্রম না করে থাকে ; নইলে $\left\{m-\left(5h+\frac{m}{12}\right)\right\}$ মি-ঘর। যদি এই ব্যবধান d মি-ঘর হয়, তাহলে

$$d=\left(5h+\frac{m}{12}\right)-m=5h-\frac{11}{12}m,\text{যখন } 5h+\frac{m}{12}>m \text{ বা } h>\frac{11}{60}m,$$

$$\text{বা, } d=m-\left(5h+\frac{m}{12}\right)=\frac{11}{12}m-5h,\text{ যখন } 5h+\frac{m}{12}<m \text{ বা } h<\frac{11}{60}m.$$

বড় কাঁটা এবং ছোট কাঁটার পারস্পরিক অবস্থানের সম্পর্ক h এবং m-এর অনুপাতের দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। যদি $\frac{h}{m}<\frac{11}{60}$ হয়, তাহলে বুঝতে হবে বড় কাঁটা ছোট কাঁটাকে অতিক্রম করে গেছে, আর যদি $\frac{h}{m}>\frac{11}{60}$ হয়, তখন বুঝতে হবে বড় কাঁটা ছোট কাঁটাকে অতিক্রম করেনি অর্থাৎ পিছিয়ে আছে। বলাবাহুল্য, যদি $\frac{h}{m}=\frac{11}{60}$ হয়, দুটি কাঁটা একত্র (একই মুখে) থাকবে। এ ছাড়া $\frac{h}{m}$-এর মানের ওপর নির্ভর করবে উল্লিখিত d-এর দুটি সূত্রের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়। অবশ্য কোন নির্দিষ্ট d ($\neq 0$)-এর জন্য ওপরের দুটি সূত্র থেকে m-এর দুটি মান যথা $\frac{12}{11}$ ($5h\pm d$) মিঃ পাওয়া যাবে। এদের মধ্যে ছোট মানটি বড় কাঁটা ছোট কাঁটাকে অতিক্রম করার আগের সময় নির্দেশ করবে এবং অপরটি (বড়মান) বড় কাঁটা ছোট কাঁটাকে অতিক্রম করে যাওয়ার পরের সময় নির্দেশ করবে। এই দুটি সময়ের অন্তর হবে 2d মিনিট। বিভিন্ন ঘণ্টায় নির্দিষ্ট d-এর জন্য যে সময়গুলি পাওয়া যাবে তা নিচে দেওয়া হলো ঃ

0 ঘ. $\frac{12}{11}(5\times 0-d)$ মিঃ, 0 ঘ. $\frac{12}{11}(5\times 0+d)$ মিঃ
1 ঘ. $\frac{12}{11}(5\times 1-d)$ মিঃ, 1 ঘ. $\frac{12}{11}(5\times 1+d)$ মিঃ
2 ঘ. $\frac{12}{11}(5\times 2-d)$ মিঃ, 2 ঘ. $\frac{12}{11}(5\times 2+d)$ মিঃ
3 ঘ. $\frac{12}{11}(5\times 3-d)$ মিঃ, 3 ঘ. $\frac{12}{11}(5\times 3+d)$ মিঃ
ইত্যাদি।

স্পষ্টতঃই ওপরের বাম ও ডান স্তম্ভের সময়গুলি দুটি যোগোত্তর শ্রেণীভুক্ত যার সাধারণ অন্তর $\frac{60}{11}$ বা $5\frac{5}{11}$ মি.। এর থেকে একটি ফল স্পষ্ট যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দুটি কাঁটার অন্তর d মি-ঘর হলে, পুনরায় 1ঘ. $5\frac{5}{11}$ মিঃ পরে কাঁটা দুটির অন্তর d মি-ঘর হবে। এই ঘটনা 1 ঘণ্টা $5\frac{5}{11}$ মিনিট পরপর ঘটতে থাকবে।

এখন দুটি কাঁটার কয়েকটি বিশেষ পারস্পরিক অবস্থানের আলোচনায় আসা যেতে পারে।

(ক) দুটি কাঁটা একত্র কিন্তু একমুখী, $d=0$, $m=\frac{60}{11}h$; সময় ঃ h ঘ. $\frac{60}{11}h$ মিঃ

(খ) দুটি কাঁটা একত্র কিন্তু বিপরীতমুখী, $d=30$, $m=\frac{12}{11}(5h\pm 30)$; সময় ঃ h ঘ. $\frac{12}{11}(5h\pm 30)$ মিঃ

(গ) দুটি কাঁটা পরস্পর লম্ব, $d=15$, $m=\frac{12}{11}(5h\pm 15)$; সময় ঃ h ঘ. $\frac{12}{11}(5h\pm 15)$ মিঃ

উল্লেখ্য, কোন ক্ষেত্রে যদি m-এর মান 60-এর অধিক হয়, তাহলে h-এর মান তদনুযায়ী বৃদ্ধি করে m-কে 60-এর কম রাখতে হবে। আবার যদি m-এর মান ঋণাত্মক হয়, তাহলে h-এর মান তদনুযায়ী কমিয়ে m-কে ধনাত্মক এবং 60-এর কম রাখা দরকার।

ঘড়ির অঙ্ক-বিষয়ক খুবই প্রচলিত আর এক ধরনের সমস্যার অবতারণা করা যেতে পারে। সমস্যাটি হলো দুটি কাঁটার পরস্পর স্থান বিনিময়ের সমস্যা। কোন এক নির্দিষ্ট সময় বড় কাঁটা এবং ছোট কাঁটার অবস্থান নিরীক্ষণ করা হলো, সময়ান্তরে দেখা গেল বড় কাঁটাটি ছোট কাঁটার স্থান দখল করেছে এবং ছোট কাঁটাটি বড় কাটার স্থানে এসেছে। এই স্থান বিনিময় খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু সমস্যা হলো নির্দিষ্ট ঘণ্টায় এই স্থান বিনিময়ের প্রারম্ভিক এবং অন্তিম সময় দুটি নির্ণয় করা এবং এদের অন্তর নির্ণয় করা।

মনে করি h ঘ. m মি-এ কাঁটা দুটির যে অবস্থান ছিল ; h′ ঘ. m′ মি-এ ($h'>h$) দেখা গেল কাঁটা দুটির স্থান বিনিময় হয়েছে। স্পষ্টতঃই h ঘ. m মি-এ বড় কাঁটার অবস্থান m মিনিট ঘরে এবং ছোট কাঁটার অবস্থান $\left(5h+\frac{m}{12}\right)$ মিনিট ঘরে। প্রশ্নানুসারে পরবর্তী ক্ষেত্রে বড় কাঁটা $\left(5h+\frac{m}{12}\right)$ মিনিট ঘরে এবং ছোট কাঁটা m মিনিট ঘরে।

এখন h′ ঘ. m′ মি-এ বড় কাঁটার অবস্থান m′ ঘরে

এবং ছোট কাঁটার অবস্থান $\left(5h' + \frac{m'}{12}\right)$ মিনিট ঘরে।

স্থান বিনিময়ের শর্তানুসারে

$$m = 5h' + \frac{m'}{12} \text{ এবং } m' = 5h + \frac{m}{12}$$

অর্থাৎ $m + m' = \frac{60}{11}(h'+h)$ এবং $m - m' = \frac{60}{13}(h'-h)$

বা, $m = \frac{60}{143}(12h'+h)$ এবং $m' = \frac{60}{143}(h'+12h)$

∴ প্রারম্ভিক সময় —h ঘ. $\frac{60}{143}(12h'+h)$ মি.

এবং অন্তিম সময় —h' ঘ. $\frac{60}{143}(h'+12h)$ মি.

সময়ের অন্তর $= (h'-h)$ ঘণ্টা $\frac{60}{13}(h-h')$ মিনিট

$= (h'\,h\text{-}1)$ ঘণ্টা $60\left(1 - \frac{h'-h}{13}\right)$ মিনিট

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ওপরের আলোচনাটি আরও স্পষ্ট হবে।

উদাহরণ ঃ এক ব্যক্তি একটি কাজ 2টা থেকে 3টার মধ্যে কোন এক সময় শুরু করে এবং 6টা থেকে 7টার মধ্যে কোন এক সময় শেষ করে। তখন দেখা গেল যে কাঁটা দুটি পরস্পর স্থান বিনিময় করেছে। কখন কাজটি শুরু এবং শেষ হয়েছিল আর কতক্ষণ ধরেই বা কাজটি চলেছিল ?

সমাধান—এখানে $h = 2,\ h' = 6$

$$\therefore m = \frac{60}{143}(12h'+h) = \frac{60}{143}(12 \times 6 + 2) = 31\frac{7}{143}$$

$$\text{এবং } m' = \frac{60}{143}(h'+12h) = \frac{60}{143}(6 + 12 \times 2) = 12\frac{84}{143}$$

∴ কাজ শুরু করার সময় $= 2$ ঘ. $31\frac{7}{143}$ মি. বা 2টা বেজে $31\frac{7}{143}$ মিনিট,

কাজ সমাপ্ত করার সময় $= 6$ ঘ. $12\frac{84}{143}$ মি. বা 6টা বেজে $12\frac{84}{143}$ মিনিট,

এবং কাজটি চলেছিল $(h'-h\text{-}1)$ ঘণ্টা $60\left(1 - \frac{h'-h}{13}\right)$ মিনিট

$= (6-2-1)$ ঘণ্টা $60\left(1 - \frac{6-2}{13}\right)$ মিনিট

$= 3$ ঘণ্টা $41\frac{7}{13}$ মিনিট ধরে।

ওপরের সমস্ত আলোচনায় যে সময়গুলি উক্ত হয়েছে তা একটি শুদ্ধ ঘড়ির পরিপ্রেক্ষিতে। শুদ্ধ ঘড়িতে বড় কাঁটা সমগতিতে ঠিক এক ঘণ্টায় ঘড়ির ফলকটিকে (অর্থাৎ 60 মি-ঘর) একবার পাক দেয়। যদি কোন ঘড়িতে বড় কাঁটা একঘণ্টায় একবার পাক না দেয়, তাহলে বুঝতে হবে সেই ঘড়ির নির্দেশিত সময় ত্রুটিপূর্ণ। এই ত্রুটি নির্ধারণ করতে গেলে আর একটি শুদ্ধ ঘড়ির সময়ের সঙ্গে তুলনা করতে হবে। বলা বাহুল্য, প্রায় সব ঘড়িই ত্রুটিপূর্ণ; দৈনন্দিন জীবনে সেই ত্রুটি সহনীয় বলে গ্রাহ্য করা হয় না। যদি কোন সময়ে শুদ্ধ ঘড়ি এবং অশুদ্ধ ঘড়ির নির্দেশিত সময় T এবং T' হয়, তাহলে অশুদ্ধ ঘড়ির সময়ের ত্রুটির পরিমাণ $= T - T'$। যদি $T > T'$, তাহলে অশুদ্ধ ঘড়িটি মন্থর আর যদি $T < T'$, তাহলে অশুদ্ধ ঘড়িটি দ্রুত। ত্রুটির পরিমাণ (চিহ্নসহ অর্থাৎ দ্রুত না মন্থর) জানা থাকলে, অশুদ্ধ ঘড়ির সময় থেকে শুদ্ধ ঘড়ির সময় সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু ঘড়ির যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ত্রুটির পরিমাণ ধ্রুবক না থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ ঘড়ির সময়ের সম্পর্ক কিছু জটিল প্রকৃতির।

মনে করি শুদ্ধ ঘড়িতে যখন সময় T_o ঘণ্টা তখন অশুদ্ধ ঘড়িতে সময় $(T_o + K)$ ঘণ্টা (k ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে); সময় অন্তরে শুদ্ধ ঘড়িতে যখন T ঘণ্টা, মনে করি অশুদ্ধ ঘড়িতে সময় T' ঘণ্টা। যদি অশুদ্ধ ঘড়িটি ঘণ্টায় দ্রুত বা মন্থর না যায়, তাহলে স্পষ্টই $T' = T + K$। কিন্তু যদি অশুদ্ধ ঘড়িটি ঘণ্টায় e ঘণ্টা দ্রুত $(e > o)$ বা মন্থর $(e < o)$ যায়, তাহলে অশুদ্ধ ঘড়িতে সময়ের বিচ্যুতির পরিমাণ দাঁড়াবে $(T - T_o)e$ ঘণ্টা, এবং

$$T' = (T + R) + (T - T_o)e$$

$$\text{বা, } T = \frac{1}{1+e}\,[T' + T_o e - K]$$

ওপরের সূত্রটি অশুদ্ধ এবং শুদ্ধ সময়ের সম্পর্ক নির্দেশক। দুটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ওপরের সূত্রের প্রয়োগ কৌশল দেখান হবে।

উদাহরণ ঃ একটি ঘড়ি দুপুর 12টায় 10 মিনিট দ্রুত এবং প্রতি ঘণ্টায় 2 মিনিট মন্থর যায়। 2টা থেকে

3টার মধ্যে অশুদ্ধ ঘড়ির কাঁটা দুটি লম্ব অবস্থায় থাকলে, শুদ্ধ ঘড়িতে সময় কত হবে ?

সমাধান—এখানে $T_o = 12$ অর্থাৎ o, $K = 10$ মি. $= \frac{1}{6}$ ঘণ্টা, $e = -2$ মি. $= -\frac{1}{30}$ ঘণ্টা। জানা আছে যে, যে কোন ঘড়িতে 2টা থেকে 3টার মধ্যে 2টা বেজে $27\frac{3}{11}$ মি. বা $\frac{27}{11}$ ঘণ্টায় বড় কাঁটা এবং ছোট কাঁটা লম্ব অবস্থায় থাকে। তাহলে

$$T\ (\text{শুদ্ধ সময়}) = \frac{1}{1+e}\ [\,T' + T_o e - K\,]$$

$$= \frac{1}{1-\frac{1}{30}}\ [\,\tfrac{27}{11} + OX - \tfrac{1}{30} - \tfrac{1}{6}\,]$$

$$= \frac{755}{319}\ \text{ঘণ্টা} = 2\ \text{ঘ.}\ 22\tfrac{2}{319}\ \text{মি.}$$

বা 2টা বেজে $22\frac{2}{319}$ মিনিট।

উদাহরণ ঃ একটি ঘড়ি বিকেল 4টার সময় শুদ্ধ ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল। ঘড়িটি যদি ঘণ্টায় $1\frac{1}{2}$ মি. দ্রুত যায়, তাহলে 5টা 30 মি. থেকে 6টার মধ্যে ঘড়িতে যখন কাঁটাদুটি লম্ব অবস্থায় থাকবে তখন শুদ্ধ সময় কত ?

সমাধান—এখানে $T_o = 4$ ঘণ্টা, $e = 1\frac{1}{2}$ মি. $= \frac{1}{40}$ ঘণ্টা, $K = O$। জানা আছে সব ঘড়িতে 5টা 30 মি. থেকে 6টার মধ্যে 5টা বেজে $43\frac{7}{11}$ মিনিটে বা $\frac{63}{11}$ ঘণ্টায় কাঁটা দুটি লম্ব অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ $T' = \frac{63}{11}$ ঘণ্টা। সূত্রানুসারে

$$T\ (\text{শুদ্ধ সময়}) = \frac{1}{1+e}\ [\,T' + T_o e - K\,]$$

$$= \frac{1}{1+\frac{1}{40}}\ [\,\tfrac{63}{11} + 4 \times \tfrac{1}{40} - 0\,]$$

$$= \frac{2564}{451}\ \text{ঘ.} = 5\ \text{ঘ.}\ 41\ \frac{49}{451}\ \text{মিনিট}$$

$$= 5\text{টা বেজে } 41\frac{49}{451}\ \text{মিনিট।}$$

আলোচ্য অশুদ্ধ ঘড়ি সম্পর্কে একটি বিশেষ মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করার আছে—যে কোন পূর্ণ ঘণ্টায় বড় কাঁটা ঠিক 12টার ঘরে থাকবে। এটি হওয়ার কারণ, শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ উভয় ঘড়ির বড় এবং ছোট কাঁটার গতির অনুপাত যথাক্রমে 12 : 1 সর্বদাই বজায় থাকে ধরে নেওয়া হয়েছে। যদি এই গতির অনুপাত সংরক্ষণে কোন অশুদ্ধ ঘড়ি ব্যর্থ হয়, তাহলে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ ঘড়ির সময়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ আগে পাওয়া গেছে তা কার্যকর হবে না। সেক্ষেত্রে আরও জটিল গাণিতিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়বে। ঘড়ির যান্ত্রিক গোলযোগই যে ঘড়ির সময়ের অশুদ্ধির একমাত্র কারণ তা নয়।

২৮/৪/২/১বি, শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা-২৬

ভাবনা

কারবিউরেটর

অনির্বাণ চক্রবর্তী

অন্তর্দহন এন্‌জিন্ দ্বারা চালিত মোটর গাড়ির ঠিক মতো চলার জন্য পেট্রোল ও বায়ুর সঠিক অনুপাতে মেশা প্রয়োজন। এন্‌জিন্-এর যে অংশে এই মিশ্রণ ঘটানো হয় তার নাম কারবিউরেটর।

এন্‌জিন্-এর মধ্যে জ্বালানীর দহন হচ্ছে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া, যাতে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে পেট্রোল বিক্রিয়া করে-জল, তাপশক্তি এবং কার্বন ও অক্সিজেনের যৌগ উৎপন্ন করে। যথাযথ রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য মিশ্রণে 15 ভাগ ওজনের বায়ুর সঙ্গে এক ভাগ ওজনের পেট্রোল উপস্থিত থাকা দরকার। এই অবস্থায় উপস্থিত বায়ুর পরিমাণ পেট্রোলের পূর্ণ দহনের জন্য পর্যাপ্ত হয়। এন্‌জিন্-এ অতিরিক্ত পেট্রোল ব্যবহার করলে যে সমৃদ্ধ মিশ্রণ পাওয়া যায় তার দহনে উৎপন্ন ধোঁয়াতে অদগ্ধ পেট্রোল উপস্থিত থাকবে।

এন্‌জিন্-এর বিবিধ অবস্থা, যেমন—চালু করা, নিষ্ক্রিয় করা, ত্বরান্বিত করা, গতিশীল অবস্থা বজায় রাখা, পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করা ইত্যাদির জন্য যে বিভিন্ন অনুপাতের মিশ্রণে প্রয়োজন তা কারবিউরেটর-এ প্রস্তুত হয়।

এন্‌জিন্-এ সমস্ত বেগে এবং এন্‌জিন্ কর্তৃক বাহিত ভারের বিভিন্ন মানে যথাযথ মিশ্রণ সরবরাহ করার সামর্থ্য কারবিউরেটর-এর থাকা প্রয়োজন। এর কাজ হল পেট্রোলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সৃষ্টি করে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে এগুলি থেকে দাহ্য মিশ্রণ তৈরি করা।

কারবিউরেটর-এর মাঝখানে একটি প্রবাহরোধী কপাট বা দরজার সাহায্যে চোঙের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়ে-কমিয়ে এন্‌জিন্-এর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। বেগবর্ধক পাদানি দ্বারা চালিত একটি ঘূর্ণ-নক্ষম দণ্ডের উপর কপাট দরজাটি বসানো থাকে।

ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অতি সমৃদ্ধ মিশ্রণ সরবরাহ করে এন্‌জিন্‌কে চালু করবার জন্য স্ট্র্যাঙ্গলার (strangler) নামে একটি বিশেষ যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়। একে সাধারণত চোক্ (choke) বলে উল্লেখ করা হয়। চিত্রটি ভালো করে দেখো, তাহলেই কারবুরেটর কিভাবে কাজ করে সেটা বুঝতে পারবে।

ফায়ার অ্যালার্ম

আশীষকুমার রায়

আজ তোমাদের একটা সুন্দর মডেল তৈরি শেখাবো। নামটা বলে রাখি 'ফায়ার অ্যালার্ম'। তোমরা সহজেই তৈরী করতে পার। এইটি তৈরির জন্য মোটামুটি নিচের এই জিনিস হলেই চলবে। (i) একটা কলিং বেল (ii) একটা ড্রাই ব্যাটারি (iii) ৬/৭ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি প্রস্থ একটা পিতল ও টিনের পাত (iv) খানিকটা তার (v) একটা পিতলের বড় স্ক্রু (vi) কিছু পেরেক বা ছোট স্ক্রু (vii) ১ ফুট লম্বা ; ৫ ইঞ্চি প্রস্থ একটা কাঠের টুকরো (viii) দেশালাইয়ের বাক্স থেকে একটু বড় দুটো কাঠের টুকরো। ব্যাস্, এই দিয়েই আমাদের কাজ আপাতত চলবে। এস এবারে তৈরির পদ্ধতিটা বলি।

প্রথমে পিতল এবং টিনের পাত দুটোকে ভাল করে রিভেট করে দাও। অথবা ১নং চিত্রের মত কেটে ২নং চিত্রের মত করে জুড়ে দাও। লক্ষ্য রাখবে পাত দুটো যাতে ফাঁকা না থাকে। এবারে কাঠের টুকরো নাও ও ৩ নং চিত্রের মত কর; কাঠের মাঝে সামান্য কেটে ঠেসে পাতটা ঢুকিয়ে দাও। দরকার হলে পেরেক মারতে পার। এবারে ৪নং চিত্রে যে থাকে 'ক' কাঠের কাঠের টুকরো (৩ নং চিত্রের টা) ও 'খ' কাঠের টুকরো বসান আছে, ঠিক সেই ভাবে তলা দিয়ে পেরেক বা স্ক্রু দিয়ে ভাল করে আটকে দাও 'খ' কাঠের টুকরোতে পিতলের বড় স্ক্রুটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে ঢুকিয়ে দাও। এবারে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখ যে তিন নং চিত্রের জিনিসটার টিনের দিকটা স্ক্রুর দিকে আছে নাকি। যদি না থাকে তবে ঠিক করে বসিয়ে নাও। ব্যাটারি থেকে একটা তার সোজা স্ক্রুর সাথে লাগাও (বড় পিতলের স্ক্রুর সাথে) অপর তারটা কলিং বেলের সাথে যুক্ত করে যেখানে পাতটার একটা প্রান্ত 'ক' কাঠের সাথে যুক্ত সেই খানে যুক্ত কর। ব্যাস্ তোমাদের 'ফায়ার অ্যালার্ম তৈরী শেষ।

তোমার ঘরের যেখানে আগুন লাগার ভয় সেই জায়গায় একটা সুবিধে মত জায়গায় ওটাকে বসিয়ে দাও। কলিং বেল ও ব্যাটারি তোমার সুবিধে মত জায়গায় রেখে দাও। তবে হ্যাঁ ব্যাটারি, কলিং বেল প্রভৃতি থেকে যদি যন্ত্রর দূরত্ব বেড়ে যায়, তবেই ব্যাটারি বাড়াতে হবে।

কারণ—আগুন বা তাপে ধাতুর প্রসারণ ঘটে। কিন্তু সব ধাতুর ক্ষেত্রে সমান নয়। পিতল টিন থেকে বেশী বড়ে। তাই তাপ পাওয়ার সাথে সাথে টিন বেঁকে স্ক্রুর সাথে লাগে ও একটা আবর্তের সৃষ্টি হয়। তাই কলিং বেল বেজে ওঠে।

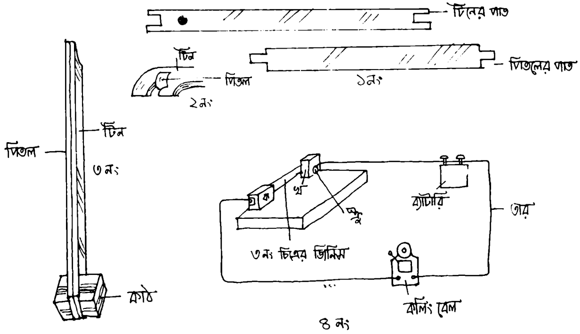

চাদমারি মাঠ, সোনারপুর, ২৪-পরগনা।

স্বাধীনতার দৌলতেই আমাদের এই সুযোগ

"রাষ্ট্রের কল্যাণে এই যে কর্মযজ্ঞ সেটা দেশের সার্বিক উন্নয়নের গোটা পরিকল্পনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কোন্ ক্ষেত্রে কতটা জোর দিলে উন্নয়ন কোন পর্যায়ে দ্রুত সফল হয়ে উঠবে এই কার্যসূচী তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।"

এই কার্যসূচীর সফল রূপায়ণ প্রত্যেক নাগরিকের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল

আসুন এই দলে আমরা সবাই যোগ দি

"এই কার্যসূচী আমাদের প্রত্যেকের স্বার্থে, আমাদের দেশের স্বার্থে, যে দেশ আমাদের নিজেদের এবং যে দেশকে সযত্নে লালন করতে হবে, সেবা করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে।"

—প্রধান মন্ত্রী
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

স্বাধীনতার ৩৬তম বর্ষ—নবম এশিয়াড ক্রীড়ানুষ্ঠানের বর্ষ।

davp 82/208

জৈব রসায়নের বিক্রিয়া

অমরনাথ রায়

(12) **সন্ধানক্রিয়া** (Fermentation) ঃ

যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন জটিল জৈব যৌগ কোন নিম্নশ্রেণীর জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ কোষের উপস্থিতিতে সহজতর গঠন সংকেত সম্পন্ন জৈব যৌগে পরিণত হয়, তাকে বলা হয় সন্ধান ক্রিয়া বা 'ফার্মেণ্টেশন'। উদাহরণ ঃ

দ্রাক্ষা শর্করা বা গ্লুকোজের জলীয় দ্রবণে ঈস্ট নামক নিম্নশ্রেণীর এক কোষী উদ্ভিদ সাধারণ উষ্ণতায় (20°C—30°C) মেশালে গ্লুকোজ বিযোজিত হ'য়ে ইথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন করে এবং সেই সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়।

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{ইস্ট}} 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow$$

গ্লুকোজ (ইথাইল অ্যালকোহল)

বিক্রিয়াটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণে ফেনার সৃষ্টি হয় এবং উষ্ণতার কোন পরিবর্তন না ঘটেই দ্রবণটি ফুটছে বলে মনে হয়। তরল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বুদ-বুদের আকারে নির্গত হওয়ার জন্যেই এমনটি হয়। ঈস্টের প্রভাবে গ্লুকোজের ইথাইল অ্যালকোহলে পরিণত হওয়াকে অ্যালকোহলীয় সন্ধান ক্রিয়া (alcoholic fermentation) বলা হয়।

(13) **উইলিয়ামসনের বিক্রিয়া** (Williamson's reaction) ঃ

অ্যালকোহলীয় সোডিয়াম বা পটাসিয়াম অ্যালকোক্সাইডের সঙ্গে অ্যালকিল হ্যালাইড মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে 'ইথার' উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ার নাম 'উইলিয়ামসনের বিক্রিয়া'। এই বিক্রিয়ার দ্বারা সরল ও মিশ্র, উভয় ইথারই সহজে প্রস্তুত করা যায়।

উদাহরণ ঃ—সোডিয়াম মিথক্সাইডের সঙ্গে ইথাইল আয়োডাইডের বিক্রিয়ায় মিশ্র ইথার (মিথাইল—ইথাইল ইথার) পাওয়া যায়।

$$CH_3ONa + C_2H_5I = CH_3-O-C_2H_5 + NaI$$

(সোডিয়াম মিথক্সাইড) (মিথাইল-ইথাইল ইথার।)

(14) **বেয়ার-এর পরীক্ষা** (Baeyer's test):

কোন যৌগ অসংপৃক্ত কিনা তা বেয়ার-এর পরীক্ষা দ্বারা জানা যায়। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের শীতল ও লঘু (1%) ক্ষারীয় দ্রবণের মধ্যে ইথিলিন গ্যাস পরিচালনা করলে বেগুনী রঙের দ্রবণটি বর্ণহীন হয়। ইথিলিন জারিত হয়ে 'ইথিলিন গ্লাইকল'এ পরিণত হয়।

[আরও রাসায়নিক বিক্রিয়ার আলোচনা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।]

$$H_2C=CH_2 + H_2O + O \xrightarrow[KM_nO_4 \text{ দ্রবণ}]{\text{ক্ষারীয়}} H_2C(OH)-CH_2(OH)$$

(ইথিলিন গ্লাইকেল)

(15) **ক্লিমেনসেন এর বিজারণ বিক্রিয়া** (Clemensen reduction) ঃ

ক্লিমেনসেন বিক্রিয়ার দ্বারা অ্যালডিহাইডকে (CH_3CHO) বিজারিত করে অ্যালকেন গোষ্ঠীয় হাইড্রোকার্বন প্রস্তুত করা হয়। জিংক অ্যামালগাম (জিংক ও পারদের ধাতু সংকর) ও গাঢ় HCl দ্বারা অ্যাসিট্যাল ডিহাইডকে বিজারিত করলে ইথেন (C_2H_6) নামক হাইড্রোকার্বন যৌগ উৎপন্ন হয়।

$$CH_3CHO \xrightarrow[Zn/Hg + HCl]{[H]} CH_3-CH_3 + H_2O$$

(ইথেন)

এটি ক্লিমেনসেন বিজারণ বিক্রিয়ার উদাহরণ।

(16) **রোজেনমণ্ড-এর বিজারণ বিক্রিয়া** (Rosenmund's reaction) ঃ

ফ্যাটি অ্যাসিড ক্লোরাইড থেকে অ্যালডিহাইড প্রস্তুত করা যায় এই বিক্রিয়ার সাহায্যে। বেরিয়াম সালফেটযুক্ত প্যালাডিয়াম প্রভাবকের উপস্থিতিতে অ্যাসিড ক্লোরাইড হাইড্রোজেন দ্বারা বিজারিত হয়ে অ্যালডিহাইডে পরিণত হয়। বিজারণের এই পদ্ধতিকে 'রোজেনমাণ্ড বিজারণ' বলে। উদাহরণ ঃ—অ্যাসিটাল ক্লোরাইড (CH_3COCl) হাইড্রোজেন দ্বারা বিজারিত হ'য়ে অ্যাসিট্যালডিহাইড (CH_3CHO) উৎপন্ন করে।

$$CH_3COCl \xrightarrow[H_2]{Pd/BaSO_4} CH_3CHO + HCl$$

(17) **অ্যালডল কনডেনসেশন** (Aldol Condensation) **:**

যে রাসায়নিক-বিক্রিয়ায় দুই বা তার বেশী পদার্থ (অভিন্ন বা বিভিন্ন) পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন ধর্ম-বিশিষ্ট জটিল যৌগে পরিণত হয়, তাকে 'কনডেনসেশন বিক্রিয়া' বলে।

একই রকম বা দুটি বিভিন্ন রকমের α-হাইড্রোজেন বিশিষ্ট কার্বনিল যৌগের অণু লঘু অ্যাসিড বা ক্ষার দ্রবণের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত হ'য়ে বিটা-হাইড্রক্সি কার্বনিল যৌগ উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়াকে 'অ্যালডল কনডেন-সেশন' বলে। বিক্রিয়ার ফলে যে বিটা-হাইড্রক্সি কার্বনিল যৌগ উৎপন্ন হয় তাকে অ্যালডল (Aldol) বলে।

যে সব হাইড্রোজেন পরমাণু —CHO মূলকের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত কার্বন পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, সেই সব হাইড্রোজেন পরমাণুকে α-হাইড্রোজেন পরমাণু বলে।

উদাহরণ :— সাধারণ উষ্ণতায় অ্যাসিট্যালডিহাইডের সঙ্গে লঘু NaOH বা Na_2CO_3 অথবা লঘু অ্যাসিডের বিক্রিয়ায়, দুই অণু অ্যাসিট্যালডিহাইড পরস্পর যুক্ত হ'য়ে 'অ্যালডল' অর্থাৎ বিটা-হাইড্রক্সি বিউটির‍্যালডিহাইড যৌগ উৎপন্ন করে। উৎপন্ন যৌগে একাধারে—OH এবং—CHO মূলক বর্তমান থাকায় যৌগটিকে অ্যালকোহল ও অ্যালডি-হাইডের ধর্ম বিদ্যমান থাকে। এই কারণেই যৌগটির এই রকম নাম (অ্যালডল) রাখা হয়েছে।

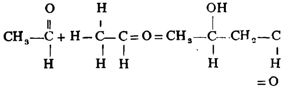

ফর্ম্যালডিহাইডে α-হাইড্রোজেন নেই। তাই শুধু দুই অণু ফর্ম্যালডিহাইডের মধ্যে অ্যালডল বিক্রিয়া হয় না। তবে ফর্ম্যালডিহাইড ও অ্যাসিট্যালডিহাইডের মধ্যে এই বিক্রিয়া হয়। যথা :—

$$HCHO + CH_3CHO = HCH(OH)CH_2CHO$$

(18) **ক্যানিজারো বিক্রিয়া** (Connizaro's reaction) **:**

যে সমস্ত অ্যালডিহাইডে α-হাইড্রোজেন পরমাণু নেই, তারা তীব্র ক্ষার দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে এক অণু অ্যালকোহল এবং এক অণু অ্যাসিড (ব্যবহৃত ক্ষারের ধাতব লবণরূপে) উৎপন্ন করে। ফর্ম্যালডিহাইড, বেনজ্যাল-ডিহাইড ইত্যাদি অ্যালডিহাইডে α-হাইড্রোজেন থাকে না বলে এই সব অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে ক্যানিজারো বিক্রিয়া হয়।

অ্যালডিহাইডের —CHO মূলকটির সঙ্গে সরাসরি যে কার্বন পরমাণুটি যুক্ত থাকে তাকে α-কার্বন বলে। আর এই α-কার্বনের সঙ্গে যুক্ত H পরমাণুকে α-হাইড্রোজেন বলে।

উদাহরণ :—

$$2HCHO + NaOH = CH_3OH + HCOONa$$

$$2C_6H_5CHO + NaOH = C_6H_5CH_2OH + C_6H_5COONa$$

(বেঞ্জ্যালডিহাইড)

(19) **হফম্যানের অবনয়ন বিক্রিয়া** (Hofmann's degradation) **:**

অ্যাসিটামাইডকে (CH_3CONH_2) ব্রোমিন ও কস্টিক পটাশ দ্রবণের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে মিথাইল অ্যামিন (প্রাইমারী অ্যামিন) উৎপন্ন হয়। এই অ্যামিনে অ্যাসিড অ্যামাইড অপেক্ষা একটি কার্বন পরমাণু কম থাকে। প্রাইমারী অ্যামিন প্রস্তুতির এই রকম বিক্রিয়াকে 'হফম্যানের অবনয়ন বিক্রিয়া' বলা হয়। বিক্রিয়াটি তিনটি ধাপে সম্পূর্ণ হয়।

(i) $CH_3CONH_2 + Br_2 + KOH = CH_3CO\ NHBr + KBr + H_2O$ (অ্যাসিটো ব্রোমো অ্যামাইড)

(ii) $CH_3CONHBr + KOH = CH_3NCO + KBr + 2H_2O$ (মিথাইল আইসো সায়ানেট)

(iii) $CH_3NCO + 2\ KOH = CH_3NH_2 + K_2CO_3$ (মিথাইল অ্যামিন)

মোট বিক্রিয়া : $CH_3CONH_2 + Br_2 + 4KOH = CH_3NH_2 + 2KBr + K_2CO_3 + 2H_2O.$

(20) **ফ্রিডেল-ক্রাফ্টস বিক্রিয়া** (Friedel-Craft's reaction) **:**

অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে অ্যাল-কিল হ্যালাইডের সঙ্গে অতিরিক্ত বেঞ্জিনের বিক্রিয়ায় বেঞ্জিনের একটি H পরমাণু অ্যালকিল মূলক দ্বারা প্রতি-স্থাপিত হ'য়ে অ্যালকিল বেঞ্জিন বা বেঞ্জিনের সমগোত্রীয় হাইড্রোকার্বন যৌগ উৎপন্ন করে। বেঞ্জিনের সমগোত্রীয় যৌগ প্রস্তুতির এই রকম বিক্রিয়ার নাম 'ফ্রিডেল ক্রাফ্টস বিক্রিয়া'।

উদাহরণ ঃ—শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে বেঞ্জিন, মিথাইল ক্লোরাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া ক'রে টলুইন ($C_6H_5CH_3$) উৎপন্ন করে।

$$C_6H_6 + CH_3Cl + [AlCl_3] = C_6H_5CH_3 + HCl + [AlCl_3]$$

(21) **হাইড্রোজেনেশন** (Hydrogenation) :

টলুইন বাষ্প এবং হাইড্রোজেনের মিশ্রণকে 180°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত নিকেল প্রভাবকের উপর দিয়ে চালনা করলে টলুইনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের সংযোগ ঘটে 'হেক্সা হাইড্রোটলুইন' নামক জৈব যৌগ উৎপন্ন হয়।

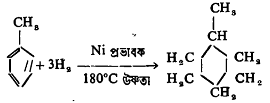

এটি হাইড্রোজেন ও টলুইনের একটি যুক্ত বিক্রিয়া।

(22) **ফিটিগ বিক্রিয়া** (Fittig reaction) ঃ

ব্রোমোবেঞ্জিন, মিথাইল ব্রোমাইড ও ইথারে দ্রবীভূত ধাতব সোডিয়ামের বিক্রিয়ায় টলুইন উৎপন্ন হয়। এর নাম 'ফিটিগ বিক্রিয়া'। এটি অন্যান্য অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন প্রস্তুতির একটি সাধারণ পদ্ধতি।

$$C_6H_5Br + 2Na + BrCH_3 = C_6H_5CH_3 + 2NaBr$$

(ব্রোমো বেঞ্জিন) (মিথাইল ব্রোমাইড) (টলুইন)

(23) **ডায়াজো বিক্রিয়া** (Diazo reaction) ঃ

অ্যানিলিন ($C_6H_5NH_2$) লঘু HCl এর উপস্থিতিতে 0°C-5°C উষ্ণতায় নাইট্রাস অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া ক'রে 'বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড' নামক যৌগ গঠন করে। শীতল অবস্থায় প্রাইমারী অ্যারোমেটিক অ্যামিনের সঙ্গে নাইট্রাস অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ডায়াজোনিয়াম লবণ গঠনের বিক্রিয়াকে 'ডায়াজো বিক্রিয়া' বলে।

এই বিক্রিয়ার সোডিয়াম নাইট্রাইট ও HCl থেকে নাইট্রাস অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

$$C_6H_5NH_2 + NaNO_2 + 2HCl = C_6H_5N_2Cl + NaCl + 2H_2O$$

(বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড)

এই রকম অবস্থায় বা শর্তে অ্যালিফ্যাটিক প্রাইমারী অ্যামিন ডায়াজো লবণ গঠন করে না। সুতরাং এই বিক্রিয়ার সাহায্যে অ্যালিফ্যাটিক ও অ্যারোমেটিক প্রাইমারী অ্যামিনের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

(24) **স্যাণ্ডমায়ার বিক্রিয়া** (Sandmeyer's reaction) ঃ

বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণকে HCl এ দ্রাবিত কিউপ্রাস ক্লোরাইড সহ 60°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে ফিনাইল ক্লোরাইড বা ক্লোরোবেঞ্জিন উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে, HBr অ্যাসিডে দ্রাবিত কিউপ্রাস ব্রোমাইড সহ উত্তপ্ত করলে ফিনাইল ব্রোমাইড পাওয়া যায়। আবার কিউপ্রাস সায়ানাইড (CuCN) ও পটাসিয়াম সায়ানাইড (KCN) দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়ায় বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম লবণ 'সায়ানো বেঞ্জিন' বা 'ফিনাইল সায়ানাইডে (C_6H_5CN) পরিণত হয়।

এইভাবে বেঞ্জিন ডায়াজোনিয়াম লবণের $-N_2Cl$ অংশ হ্যালোজেন বা সায়ানো মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত ক'রে হ্যালোজেন বা সায়ানো যৌগ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে 'স্যাণ্ডমায়ার বিক্রিয়া' বলে। উদাহরণ ঃ—

$$C_6H_5—N=N-Cl \xrightarrow[HCl]{CuCl} C_6H_5Cl + N_2$$

$$C_6H_5—N=N-Cl \xrightarrow[HBr]{CuBr} C_6H_5Br + N_2$$

$$C_6H_5—N=N-Cl \xrightarrow[KCN]{CuCN} C_6H_5CN + N_2$$

স্যাণ্ডমায়ার বিক্রিয়া দ্বারা বেঞ্জিন বলয়ে পরোক্ষভাবে হ্যালোজেন, সায়ানাইড, কার্বাকসিল ইত্যাদি মূলক প্রবেশ করানো যায়।

(25) **রাইমার টিম্যান বিক্রিয়া** (Riemer-Tiemann reaction) ঃ

এই বিক্রিয়ার সাহায্যে ফেনল থেকে হাইড্রক্সিবেঞ্জাল-ডিহাইড বা স্যালিস্যালডিহাইড প্রস্তুত করা যায়।

ফেনলের সঙ্গে ক্লোরোফর্ম ও অ্যালকোহলীয় কস্টিক পটাশ দ্রবণ মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে অর্থো ও প্যারা হাইড্রক্সি বেঞ্জালডিহাইড উৎপন্ন হয়। অ্যারোমেটিক হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড গঠনের এই বিক্রিয়াকে 'রাইমার টিম্যান বিক্রিয়া' বলে।

$$C_6H_5OH + CHCl_3 \xrightarrow{KOH} C_6H_4(OH)CHO$$

(অর্থো ও প্যারা হাইড্রক্সি বেঞ্জালডিহাইড)

(26) **লিবারম্যান বিক্রিয়া** (Lieberman's reaction) :

এটি ফেনলের সনাক্তকরণের পরীক্ষা। একটি পরীক্ষা নলে গাঢ় H_2SO_4 ও সামান্য সোডিয়াম নাইট্রাইট কেলাস নিয়ে ঈষৎ উষ্ণ ক'রে তাতে দু'এক ফোঁটা ফেনল (C_6H_5OH) যোগ করলে দ্রবণটি প্রথমে লাল ও পরে নীল বর্ণ ধারণ করে। এই নীল দ্রবণ জলে ঢাললে পুনরায় লাল দেখায়। এতে অতিরিক্ত কস্টিক সোডা (NaOH) যোগ করলে দ্রবণটি পুনরায় নীল হয়।—এই বিক্রিয়াকে 'লিবারম্যান বিক্রিয়া' বলে।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1. $2CH_4 + O_2 = 2CH_3OH$ বিক্রিয়াটি কি ধরনের বিক্রিয়া ? এই বিক্রিয়ার শর্তগুলি কি ?

2. নাইট্রেশন বিক্রিয়া বলতে কি বোঝ ? উদাহরণ দাও।

3. উদাহরণ সহযোগে হ্যালোজেনেশন বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

4. 'সালফোনেশন' বিক্রিয়া কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

5. জৈব যৌগের 'তাপ বিযোজন বিক্রিয়া' (Pyrolysis) উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

6. মিথেনের সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়া বিক্ষিপ্ত সূর্যালোকে কিভাবে ঘটে তা সমীকরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

7. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

(ক) কোলবের বিক্রিয়া (খ) ভার্জ বিক্রিয়া (গ) ওজোন বিশ্লেষণ (ঘ) সন্ধান ক্রিয়া (ঙ) যুত বিক্রিয়া।

8. ইথিলিন থেকে পলিথিন প্রস্তুতির বহুসংযোগ ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

9. উইলিয়ামসনের বিক্রিয়া ও বেয়ার এর পরীক্ষা ব্যাখ্যা কর।

10. α-হাইড্রোজেন পরমাণু কাকে বলে ? অ্যালডল এর রাসায়নিক নাম কি ? অ্যালডল কনডেনসেশন বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

11. ক্লিমেনসেন বিজারণ বিক্রিয়া এবং রোজেনমণ্ড এর বিজারণ বিক্রিয়া উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

12. কোন্ বিক্রিয়ার সাহায্যে অ্যালিফ্যাটিক ও অ্যারোমেটিক প্রাইমারী অ্যামিনের পার্থক্য নির্ণয় করা যায় ? বিক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

13. নিম্নলিখিত জৈব বিক্রিয়াগুলি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও :—

(ক) ফিটিগ বিক্রিয়া (খ) হফ্‌ম্যানের অবনয়ন বিক্রিয়া (গ) রাইমার টিম্যান বিক্রিয়া (ঘ) লিবারম্যান বিক্রিয়া।

14. কোন্ বিক্রিয়া দ্বারা বেঞ্জিন বলয়ে পরোক্ষভাবে হ্যালোজেন মূলক বা সায়ানাইড মূলক প্রবেশ করানো যায়। উদাহরণ সহযোগে বিক্রিয়াটি লিখ।

15. হাইড্রোজেনেশন বিক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

—শেষ—

ঘোষণা

অমরনাথ রায় লিখিত "রসায়নের সহজ পাঠ" ধারাবাহিক রচনাটি শেষ হলো। এবারে শ্রী রায় নতুন ক'রে শুরু করবেন আর একটি ধারাবাহিক রচনা "সহজ কথায় রসায়ন।" নভেম্বর, ৮২ সংখ্যা থেকে 'সহজ কথায় রসায়ন' পর্যায়ের রচনাগুলিতে তোমরা একে একে পাবে মাধ্যমিকের পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত রসায়ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়। প্রথমে থাকবে বিভিন্ন গ্যাসের কথা। পরে একে একে পাবে বিভিন্ন অ্যাসিড, ধাতু ও নিত্য প্রয়োজনীয় যৌগের কথা। সব শেষে থাকবে ভৌত রসায়নের কথা। নতুন আঙ্গিকে লেখা ঐ রচনাগুলি তোমাদের পাঠ্য বিষয়কে ভালভাবে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করবে। কাজেই নিয়মিত কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়তে ভুলো না যেন।—সম্পাদক

ডলফিনের হাসি

ধীরেন দত্ত

গত বছর কলকাতায় একজন আমেরিকান সমুদ্র বিজ্ঞানীর সাথে আমার কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, "যতবার আমি ডলফিনদের জলের উপর মাথা তুলতে দেখেছি, দেখেছি ওদেরহাসি মাখা মুখ।" ডলফিনদের হাসি মাখানো মুখের কথা আরও অনেক বিজ্ঞানী বলেছেন। কেন যে ওরা হাসে!

অনেকদিন আগে বিলেতের এ্যানিম্যাল পত্রিকায় একটা গল্প পড়েছিলাম। একবার ফ্লোরিডার সমুদ্রোপকূলে এক মহিলা সমুদ্রে স্নান করছিলেন, হঠাৎ চোরা স্রোতে তাকে গভীর জলের দিকে টানতে থাকে। মহিলাটির প্রাণ বাঁচানোর সব চেষ্টাই যখন প্রায় ব্যর্থ, জ্ঞান হারানোর পূর্ব মুহূর্তে, তার পায়ের নিচে কিসের যেন একটা স্পর্শ অনুভব করলেন। একটা প্রাণী যেন তাকে ডাঙ্গার দিকে ঠেলছে, শেষ পর্যন্ত পায়ের নীচে মাটির স্পর্শ পেয়ে মহিলাটির জীবন রক্ষা হল। দাঁড়িয়ে যারা ঘটনাটা দেখেছিলেন, তারা বলেছিলেন, একটা ডলফিন মহিলাটির পাশেই ভেসে উঠেছিল এবং এ বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না যে ডলফিনটাই মহিলাটির প্রাণ রক্ষা করেছে।

নদী বা তীরবর্তী সমুদ্রে প্রায়ই দেখা যায় জলের মধ্যে ডলফিন ডাইভ দিয়ে মাছ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এদেরকে Cetacea বর্গের প্রাণী বলা হয়। এরা ডাঙ্গার জন্তুদের মতই সন্তান প্রসব করে এবং বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, অতিপ্রাচীনকালে এরা নাকি জঙ্গলেরই প্রাণী ছিল। প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে সাগরের জলে এরা আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং জলেই বাঁচার মত পরিবেশ সৃষ্টি করে ন্যায়। ডলফিনরা পরস্পরের মধ্যে শব্দ বিনিময় করতে পারে এবং এদের শ্রবণশক্তি দারুণ প্রখর।

সারা পৃথিবীর সমুদ্রে এবং নদীতে প্রায় ২৯ জাতের ডলফিন বাস করে, তার মধ্যে পরপয়েজ (Porpoise) আর সুসু (Susu) ছোট আকারের ডলফিন। ১২ ফুট পর্যন্ত লম্বা ডলফিন দেখা গেছে, কিন্তু পরপয়েজরা সাত ফুটের চেয়ে লম্বা বিশেষ একটা হয় না, আর সুসুরা খুব বড়ো হলে পাঁচ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। ডলফিনরা দারুণ বুদ্ধিমান প্রাণী। সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে ওরা খুবই মজাদার এবং মানুষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। সাধারণত ওরা জলের উপরিতলে সাঁতার কেটে বেড়ায় এবং মিনিটে দু'তিনবার জলের উপর মাথা তুলে দম নেয়, দম নেবার সময় ফুস করে একটা শব্দ করে। তবে ভয় পেলে বা বিপদ বুঝলে ওরা জলের ৬৩-৭০ ফুট কিংবা আরও গভীরে চলে যায় এবং বহুক্ষণ জলের তলায় থাকতে পারে। যদিও জলের উপর মাথা তুলে দম না নিলে ডলফিনরা বাঁচতে পারে না, কিন্তু যদি ওদের ধরে ডাঙ্গায় তোলো, তাহলে দেখবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা মরে গেছে।

আমেরিকার ম্যারিনল্যাণ্ডে এবং রাশিয়ার বাতুমিবন্দরে ডলফিনারি আছে, ওখানে আবদ্ধ অবস্থায় ডলফিনদের নিয়ে নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা হয়। বাতুমিতে মাছের লোভ দেখালে ডলফিনরা লাফ দিয়ে, জলছাড়া হয়ে, বুকের পাখনা দিয়ে দর্শকদের হ্যাণ্ডসেক করে। অগভীর পুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ডলফিনদের পিঠে চড়ে মজা করে। ছেলেরা জলে নামলেই ওরা যেখানেই থাকুক সোঁ করে চলে এসে বাচ্চাদের পিঠে চড়বার সুযোগ করে দেয়।

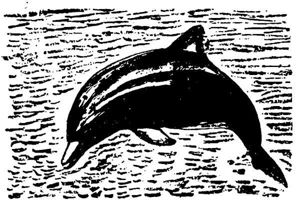

এই সুন্দর নিরীহ প্রাণীটা মানুষের কখনও ক্ষতি করে না, কিন্তু সারা পৃথিবীর সমুদ্রে ডলফিন নিধনের বড়বড় কারবার আছে। প্রধানত তিন রকম কায়দায় ডলফিন হত্যা হয়ে থাকে। মাছধরা জাহাজে করে গগন বেড় জালে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় ডলফিনদের তাড়িয়ে তীরে এনে বধ করা হয়। হারপুন ছুঁড়ে ডলফিন হত্যা অনেক পুরোনো প্রথা। হারপুন হচ্ছে অনেকটা আমাদের সড়কীর মত। আজকাল রাইফেলের সাহায্যে হারপুন ছোঁড়ার নতুন কায়দা আবিষ্কৃত হয়েছে। বন্দুকের গুলিতে আজকাল ডলফিন হত্যা করা হচ্ছে। ইউরোপে আর আমেরিকায় ছোট বোটের কামানের গোলায় এই প্রাণীদের হত্যা করার

ব্যবস্থা আছে। উত্তর মেরু সমুদ্রে ভারতের এবং শ্রীলঙ্কার অগভীর সমুদ্রে জেলেরা বড় ধরনের একরকম হা করা জাল পেতে রেখে আসে। ঝাক বেঁধে চরবার সময় ডলফিনরা ওর মধ্যে ঢুকে পড়লে আর বেরুতে পারে না। জাপানের হিরাটসুকা এবং দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে এক বিশেষ ধরনের খ্যাপলা জালে ডলফিন ও সুসু ধরার কায়দা আছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এদের মাংস, চর্বি এবং রাবার (চামড়ার ঠিক নিচের অংশটি চর্বি) বিক্রি করার বড় ব্যবসা গড়ে উঠেছে।

জাপান সমুদ্রে এবং বিষুবীয় প্রশান্ত মহাসাগরে রাফ্ টুথড্ ডলফিনদের (Rough toothed Dolphine) বাস। এরা সংখ্যায় খুব একটা বেশী নয়, তাই কালেভদ্রে দু'-দশটা মারা পড়ে। কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর মাছ-ধরা জাহাজসমূহ প্রচুর কমন ডলফিন (common Dolphine), বটলনোজ ডলফিন (Bottlenose Dolphine) এবং হারবার পরপয়েজ (Harbour Porpoise) নিধন করে থাকে। ব্লাক সী ফিসারিজ-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ১৯৪০ সালে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার কমন ডলফিন নিহত হয়েছিল। ক্রিমিয়া ও ককেশাশের তীরে বৎসরে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার এই জাতের ডলফিন বধ করা হয়ে থাকে।

পরপয়েজরা (Phocoena) ডলফিনদের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। চারটে প্রজাতির পরপয়েজ পৃথিবীর নানা সমুদ্র ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন দেশে এদের মেরে মাংস, চর্বি বিক্রী করার বড় বড় কারবার আছে। পেরুতে বৎসরে গড়ে আড়াই লক্ষ পাউণ্ড পরপয়েজের মাংস বাজারে সরবরাহ করা হয়। উরুগুয়েতে হাঙর ধরা জালে এদের ধরবার ব্যবস্থা আছে। বাল্টিক সাগর ১৬ শতাব্দী থেকে পরপয়েজ হত্যা চলে আসছে। এক এক বছর তিন হাজারের মত পরপয়েজ এখানে প্রাণ হারায়। কৃষ্ণ সাগরে জালে বেড় দিয়ে পরপয়েজ তীরে তাড়িয়ে এনে মারা হয়। এক এক বছর দু-আড়াই হাজার পরপয়েজকে এইভাবে হত্যা করা হয়ে থাকে।

কলকাতায় গঙ্গায় মাথা পিঠের পাখনা আর লেজ ভাসিয়েওঠে আর ডুবদেয় ওদের ইংরাজী নাম সুসু (Susu)। জানি না বাংলার শুশুক শব্দটা ইংরাজী সুসু থেকে এসেছে কিনা। এরা দুটি প্রজাতিতে বিভক্ত। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীতে যাদের মধ্যে মধ্যে ভেসে উঠতে দেখা যায় তারা হল Platayista gangetica। একবার ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে পাণ্ডুঘাটে স্নান করবার সময় দেখেছিলাম সুসুরা মাছের পিছনে ছুটছে। গঙ্গানদীতে যে প্রজাতিটার বাস তাদের বলা হয় Platanista indi। পাটনার কাছে গঙ্গায় ওদের ভাসতে আর ডুব দিতে দেখেছি। একবার সুন্দর-বনের সন্দেশখালিতে জেলেরা বেড়াজালে একটা সুসু ধরেছিল চার-পাঁচজন ধরাধরি করে যখন ওকে ডাঙ্গায় তোলে তখন ও হাপরের মত হাঁপাচ্ছিল আর কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই ওটা মরে গেল। আমি মেপে দেখেছিলাম। মুখ থেকে লোহার ডগা পর্যন্ত লম্বায় তিন ফুট দশ ইঞ্চি। এই এলাকায় সুসুর মাংস কেউ খায় না। ও মরে গাঙে্চড়ে সিঁটকে পড়েছিল, প্রথমে কাকেরা খুবলে খুবলে চোখদুটো খেয়ে নিল, তারপর কুকুরেরা যখন খবর পেল, তারা প্রচণ্ড মারামারি আর কোলাহলের মধ্যে ওর হাড় মাংস, চামড়া চর্বি সব চেটেপুটে সাবাড় করে দিল।

বট্লনোজ ডলফিনদের (Bottlenose dolfin) বিচরণক্ষেত্র হচ্ছে উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ সমুদ্র সমূহ। এককালে এদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী ছিল; তাই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এদের উপর বিরাট এক হত্যাকাণ্ড চলত। ভারত মহাসাগরে এরা নাকি প্রচুর মাছ খেয়ে ফেলে, তাই সিংহলের লোকেরা এদের সাগরের ক্ষতিকারক প্রাণী বলে মনে করে এবং এদের উপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়। আয়ারল্যাণ্ডের অদূরের সমুদ্রে, পশ্চিম আফরিকা, ভেনজুয়েলা ও ফ্লোরিডার নিকটবর্তী দরিয়ায়, ক্যারিবিয়ান ও মেক্সিকো উপসাগরে, এবং কৃষ্ণসাগরে এই জাতের ডলফিনদের প্রচুর সংখ্যায় নিধন করা হয়ে থাকে। এদের এত বেশী হত্যা করা হয়েছে যে, সমস্ত সাগরগুলোয় এই প্রাণীটার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

মানুষের বেহিসাবি নিধনের জন্য সমস্ত পৃথিবীর সমুদ্র-গুলোয় স্পিনার ডলফিন, কমন ডলফিন বটলনোজ ডলফিন হারবার পরপয়েজ, স্পটেড্ ডলফিন এবং আরও অনেক জাতের ডলফিন আজ বিলুপ্তির মুখোমুখি। এই সব বিবেচনা করে সোভিয়েত রাশিয়ার এক ডিক্রী জারি করে তাদের সমস্ত সমুদ্রগুলোতে ডলফিন ধরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সোভিয়েতের দেখাদেখি পূর্ব-ইউরোপের আরও কয়েকটা সমাজতান্ত্রিক দেশ একই পথ অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বহুদেশের জাহাজ সমানে ডলফিন নিধন করে চলেছে।

আমার সেই আমেরিকান সমুদ্র-বিজ্ঞানীর কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, "ডলফিনরা হাসি হাসি মুখে মানবশিশু সহ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী-শিশুদের শুভ কামনা করে।" আর আমরা মানুষেরা প্রতিদানে উত্তপ্ত হারপুন ছুঁড়ে, বেড়জালে আটক করে আর রাইফেলের গুলিতে হাজারে হাজারে ওদের হত্যা করি। আশ্চর্য !

পোঃ সন্দেশখালি, ২৪ পরগনা

রাতের আকাশ কালো কেন ?

স্বপ্না দে

রাতের আকাশ অন্ধকার কেন ? প্রশ্নটা শুনে স্কুলের ছেলেরাও লাফিয়ে উঠে বলবে যে এর উত্তর তো খুবই সহজ। আহ্নিক গতির (Diurnal motion) ফলে পৃথিবীর যে অংশ সূর্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সেখানেই নেমে আসে রাতের আঁধার। কিন্তু হ'ল না। সূর্য ছাড়াও ত' এই মহাবিশ্বে রয়েছে অসংখ্য নীহারিকা যার মধ্যে রয়েছে সূর্যের চেয়ে অনেক বড় অনেক দীপ্তিমান নক্ষত্রাবলী ! তবে কেন আমরা রাতে অন্ধকারে থাকব ?

এই প্রশ্নই করেছিলেন ১৮২৬ সালে ভিয়েনানিবাসী পদার্থবিদ্ এবং জ্যোতির্বিদ হেনরি ওলবার্স। তাঁর এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর বার করতে নানা দেশের বিজ্ঞানীদের সময় লেগেছিল একশ' বছর। তাই বিজ্ঞানী মহলে এই সমস্যার নাম দেওয়া হয়েছিল ওলবার্স কূট (The Olbers Paradox)

ওলবার্স তাঁর প্রশ্ন বিশ্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্যে যে গণনা করেছিলেন এখন তা আলোচনা করা যাক। তিনি কয়েকটা সিদ্ধান্ত প্রথমে ধরে নিয়েছিলেন—(১) মহাবিশ্ব অনন্ত এবং ইউক্লিডের জ্যামিতির সূত্র প্রয়োগ করা যায়, (২) মহাবিশ্বে দীপ্তিমান বস্তু অর্থাৎ নক্ষত্ররা সর্বত্র সমভাবে ছড়িয়ে আছে, (৩) প্রত্যেক নক্ষত্র একই পরিমাণে শক্তি বিকিরণ করছে, (৪) অনন্তকাল ধরে মহাবিশ্ব চলে আসছে ও (৫) নক্ষত্ররা বিন্দুর মত এবং তাদের পরস্পরের মাঝখানে এমন কোন বস্তু নেই যা তাদের শক্তিকে শোষণ করে আলো আসতে বাধা দেবে।

এই সব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি অঙ্ক কষে বার করলেন এই অসংখ্য নক্ষত্র পৃথিবীতে মোট কতটা আলো দেবে। ধরি একক ঘন পরিমিতি স্থানে n'সংখ্যক নক্ষত্র রয়েছে যারা একক সময়ে L শক্তি বিকিরণ করে। আমাদের অঙ্ক কষার সুবিধার জন্যে আমরা বিশ্বকে কয়েকটা সরু সমকেন্দ্রিক ঘন খোলকে ভাগ করে নিচ্ছি। এদের কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের পৃথিবী। ধরি প্রত্যেক খোলকের চওড়া হচ্ছে a। এমন একটা নির্দিষ্ট খোলক ধরলাম যার ভিতরের ব্যাসার্দ্ধ হল r আর বাইরের ব্যাসার্দ্ধ হচ্ছে a + r. সুতরাং এই খোলকের আয়তন হবে (চিত্র ১)।

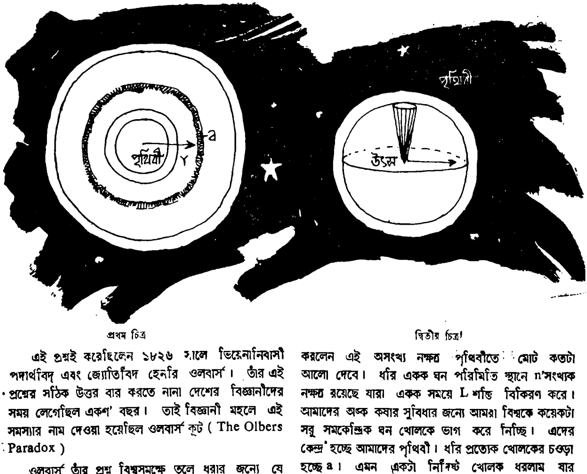

প্রথম চিত্র

দ্বিতীয় চিত্র

$$V = 4\pi r^2 a$$

তাহলে এই আয়তনে নক্ষত্র থাকবে

$$N = nv = 4\pi r^2 an.$$

খোলকগুলো খুব সরু বলে a-এর মান খুবই কম। সেইজন্য আমরা বলতে পারি যে এই N সংখ্যক নক্ষত্র বা দীপ্তিমান বস্তু পৃথিবী থেকে r দূরত্বে আছে। এখন আমাদের বার করতে হবে এই উৎসের লম্বভাবে অবস্থিত পৃথিবীপৃষ্ঠের একক ক্ষেত্র ফলবিশিষ্টস্থানে কতটা শক্তি এসে পৌছবে? উৎসটা r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট গোলকের কেন্দ্রে থাকলে একক সময়ে L শক্তি বিকিরিত হচ্ছে। গোলকের পৃষ্ঠতলের আয়তন $4hr^2$ সুতরাং একক ক্ষেত্রফল শক্তি আসছে।

$$b = \frac{L}{4\pi r^2} \quad (\text{চিত্র--2})$$

তাহলে মোট শক্তি হবে

$$Nb = \frac{L}{4\pi r^2}\ 4\pi r^2 an \ = \ anL$$

তাহলে বিশ্বজগতের সমস্ত দীপ্তিমান বস্তু থেকে মোট শক্তি পাওয়া যাবে প্রত্যেকটা এই ধরনের খোলকের শক্তি যোগ করে। কিন্তু আমরা দেখছি মোট শক্তি Nl এর সঙ্গে r-এর কোন সম্পর্ক নেই অর্থাৎ এই শক্তি দূরত্বের উপর নির্ভর করে না। এর আগে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে শক্তির উৎস দূরেই থাক বা কাছেই থাক তার অবদান থাকবে একই। (১) নং সিদ্ধান্তে ধরা হয়েছে মহাবিশ্ব অনন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ r ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলকের সংখ্যাও হবে অনন্ত এবং তার ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে যে শক্তি এসে পৌছানোর কথা তার পরিমাণও হবে অনন্ত। এখন এই শক্তি যদি আলোকশক্তি হয় তবে পৃথিবীর আকাশতো সারারাত আলোয় ঝলমল করে থাকবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষই এর বিপরীত ফল দেখে। তাহলে এই অঙ্কের মধ্যে কি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করা হয়েছে?

ওলবার্সের সমসাময়িক সময়েই প্রতিবাদের ঝড় উঠল যে তিনি আলোর উৎসকে বিন্দুর মত ধরেছেন (৫নং সিদ্ধান্ত)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ত' তা নয় তাদের নির্দিষ্ট আয়তন আছে। তাছাড়া সুদূরের ঐ উৎসদের হয়ত অন্য কোন বস্তু আড়াল করে রাখতে পারে। কিন্তু আবার অঙ্ক কষে দেখা গেল যে আড়াল করা বস্তুর উপরিতলে উৎসের সমান পরিমাণ তাপ এসে যাবে এবং তা আবার বিকিরিত হয়ে আলো দেবে। সুতরাং সমস্যার কোন সমাধান হলো না।

এবারে তাহলে তার গৃহীত অন্য সিদ্ধান্তগুলোর বিচার করি। যদি আমরা ধরি যে মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি অনন্ত না হয় তবে আমাদের নেওয়া খোলকের সংখ্যা হবে সীমিত এবং তাতে ফল খুব বেশী হেরফের হবে না। তবে বাস্তবানুগ হতে হলে এই ধারণা ত্যাগ করতে হবে কারণ এ পর্যন্ত মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে তার কোন সীমানা পাওয়া যায় নি। তবে কি বিশ্বের আয়তন নির্দিষ্ট? যেহেতু আলোর গতি মান নির্দিষ্ট তাহলে ধারণা করা যায় যে মহাবিশ্বের একদিন জন্ম হয়েছিল। ধরি সেটা আজ থেকে T বৎসর আগে। তাহলে আমাদের চোখে যে আলো এসে পড়বে তার দূরত্ব হতে পারে সব থেকে বেশী C. T. (c = আলোর গতিবেগ) অর্থাৎ আবার আমরা একটা নির্দিষ্ট মাপের বিশ্বের মধ্যে ফিরে এলাম।

এরপর এল ক্রমবর্দ্ধমান মহাবিশ্ব তত্ত্ব Expansion of the universe)। এই তত্ত্বানুযায়ী আলোর উৎস নীহারিকারা ক্রমেই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তার ফলে তাদের কাছ থেকে আসা আলো কমে যাচ্ছে দুভাবে। প্রথমতঃ আলোর উৎস আর পৃথিবীর মধ্যে রয়েছে সময়ের ব্যবধান। এর ফলে বর্ণালী বীক্ষণে লালের দিকে চ্যুত (Red shift) হয়। ধরা যাক এক সেকেণ্ডে কোন নীহারিকা থেকে যে আলো বার হচ্ছে তাদের ঘাড় ধরে তা পৃথিবীতে এসে পৌছবে অনেক বেশী সময় নিয়ে। এই বাড়তি সময়টুকু হয় লালের দিকে চ্যুতির সমান। দ্বিতীয়তঃ আবার এর ফলেই ঐ আলোর কম্পাঙ্ক যায় কমে। Planck এর সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি যে শক্তি $E = h\nu$ যেখানে h = প্লাঙ্কের ধ্রুবক আর ν কম্পাঙ্ক। তা হলে কম্পাঙ্ক কমলে শক্তি কম হবে। আলোক বহনকারী কণিকাকে বলে ফোটন। সুতরাং ফোটনরা তাদের এই বিরাট যাত্রাপথে শক্তি হারিয়ে ফেলছে। এই দুই কারণের ফলেই পৃথিবীর চারিদিকে অসংখ্য নক্ষত্র থাকলেও আমরা কেবল সূর্য ছাড়া আর কোন আলোই পাই না যাতে আমাদের রাতের আকাশও হবে রোদ ঝলমলে। অর্থাৎ বলা যায় ক্রমবর্দ্ধমান মহাবিশ্বের জন্যেই আমরা রাতে থাকি 'নিবিড় ঘন আঁধারে'।

বি।৮।৫—ইন্দ্রলোক হাউসিং এস্টেট ১, কলকাতা-২

জীবন বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

বিচিত্র উদ্ভিদ

ডক্টর তারকমোহন দাস

পৃথিবীতে কত রংয়ের উদ্ভিদ আছে? বিশেষজ্ঞরা বলেন, পৃথিবীতে উদ্ভিদ আছে প্রায় আড়াই লক্ষ রকমের। এরা শুধু আমাদের পরিচিত প্রতিবেশী রূপে ডাঙ্গার ওপর বাস করে তাই নয়, এদের অনেকে পুকুর ও বিলের মিষ্টি জলে এবং সমুদ্রের নোনা জলের মধ্যেও বসবাস করে। তার মধ্যে যাদের ফুল ফোটে, বীজ হয় সেই রকম উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার, বাদবাকী সব ব্যাকটেরিয়া, শ্যাওলা, মস্, ফার্ন ইত্যাদি অপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদ।

স্যর জে. ডি হুকারের হিসাব থেকে জানা যায় অবিভক্ত ভারতে ধান, মটরের মতো সপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদ আছে প্রায় বারো থেকে চৌদ্দ হাজার রকমের। এই বিশাল উদ্ভিদ সম্পদ সত্যই আমাদের দেশের এক প্রধান ঐশ্বর্য।

তেমনি নানা রকম কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, ও মানুষ নিয়ে আমাদের প্রাণিজগৎ। এই উদ্ভিদ ও প্রাণীরা হচ্ছে আমাদের পরিবেশের জীবউপাদান। পৃথিবীতে প্রায় দশলক্ষ রকমের প্রাণী আছে, তার মধ্যে মাত্র চুয়ান্ন হাজার বিভিন্ন রকমের মেরুদণ্ডী প্রাণী, বাকী সব কীট-পতঙ্গ, কৃমি, শামুক-ঝিনুকের মত অমেরুদণ্ডী প্রাণী। পৃথিবীতে নানা রকম উদ্ভিদের তুলনায় নানা রকম প্রাণীর সংখ্যা বেশী, কিন্তু তাহলেও উদ্ভিদের মোট পরিমাণ প্রাণীদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। পৃথিবীতে উদ্ভিদের এই আধিপত্য আছে বলেই প্রাণীরা আজও বেঁচে আছে, কেননা এই বিপুল প্রাণিজগতের কেউই নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরী করতে পারে না,—অর্থাৎ পরিবেশের অজৈব উপাদান কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল থেকে জৈব খাদ্য চিনি তৈরী করতে পারে না, সবুজ উদ্ভিদ যেটা পারে। উদ্ভিদের মূল বৈশিষ্ট্যই হল তারা সালোকসংশ্লেষ (photosynthesis) ক্রিয়ায় সূর্যের আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে জৈব খাদ্য তৈরী করতে পারে, ঐ খাদ্য খেয়েই অন্যান্য প্রাণীরা জীবনধারণ করে থাকে. সুতরাং পৃথিবীর এই বিপুল প্রাণিজগৎ সম্পূর্ণই নির্ভর করে থাকে উদ্ভিদের ওপর। যারা মাংসাশী প্রাণী তারাও নির্ভরশীল উদ্ভিদের ওপর, কেননা ঐ মাংসাশী প্রাণীরা যাদের মাংস খায়,—সেই তৃণভোজী প্রাণীরা নির্ভরশীল উদ্ভিদের ওপর। খাদ্য তৈরী ছাড়াও উদ্ভিদরা পরিবেশ থেকে দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং বিশুদ্ধ অক্সিজেন বাতাসে যোগ করে পৃথিবীকে প্রাণীর বসবাসের উপযোগী করে রাখে।

সমুদ্রের মধ্যে অজস্র রকমের প্রাণী বসবাস করে, তারাও উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে।

সমুদ্র থেকে এক ঘটি জল নিলে তার মধ্যে খালি চোখে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু ঐ জল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে প্রতি লিটার জলে প্রায় এক লক্ষ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ বাস করছে। সমুদ্রের জলের মধ্যে যতদূর সূর্যের আলো পৌঁছায় ততদূর নানা রকম সবুজ শ্যাওলাদের আধিপত্য দেখা যায়। এই শ্যাওলাদের খেয়েই ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণীরা বেঁচে থাকে, ঐ ছোট ছোট প্রাণীদের খেয়েই আবার মাঝারি সাইজের সামুদ্রিক প্রাণীরা বেঁচে থাকে। মাঝারি প্রাণীদের খেয়ে আবার বড় বড় সামুদ্রিক প্রাণীরা বেঁচে থাকে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে কি স্থলে, কি সমুদ্রে পৃথিবীর সর্বত্রই উদ্ভিদের আধিপত্য বিস্তৃত, এবং এই আধিপত্য লুপ্ত হলে প্রাণীদেরও অবলুপ্তি ঘটবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

আমাদের পরিবেশের মধ্যে যে অজস্র রকমের গাছপালা কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ ও পশুপক্ষী রয়েছে তাদের সঠিক ভাবে চিনতে হলে তাদের প্রত্যেকেরই একটা নির্দিষ্ট নাম থাকা দরকার এবং তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা, অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটা শ্রেণী বিভাগ থাকা দরকার।

বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী কার্ল ভন লিনিয়াস (১৭০৭-১৭৭৮) বিপুল অধ্যবসায়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ ও শ্রেণীবিভাগ করেন। লিনিয়াস্ ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে সুইডেনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সুইডেনের লুন্ড ও আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রথম জীবনে তিনি সুচিকিৎসক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু তিনি বরাবরই উদ্ভিদ, প্রাণী এমন কি নানা রকমের শিলা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন এবং কি ভাবে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তাই নিয়ে গবেষণা করতেন। ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে জীব জগতের শ্রেণী বিভাগের ওপর লেখা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ জেনেরা

প্ল্যান্টেরাম প্রকাশিত হয়। এর চার বছর পর ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং পুরোপুরি ভাবে জীবজগতের শ্রেণী বিভাগের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

লিনিয়াসের আগে জীবজগতের মোটামুটি একটা শ্রেণী বিভাগ ছিল। লিনিয়াস উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন। তিনি ফুলের বৈশিষ্ট্য ও জীবজন্তুর বিভিন্ন অঙ্গের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে এই শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন বলে একে বলা হয় প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ (Natural system of classification) এবং জীবের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত এই শাখাকে বলা হয় ট্যাক্সোনমী (Taxonomy) বা সিস্টেম্যাটিক বায়োলজী (systematic Biology)। আগে উদ্ভিদ বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বলতে লোকে বুঝত এই ট্যাক্সোনমী চর্চা। পৃথিবীর বিভিন্ন রকম গাছ ও প্রাণীর নাম জানা, তাদের সঠিক ভাবে চেনা এবং শ্রেণী বিভাগের কোথায় তাদের স্থান হতে পারে তা ঠিক করা। জীববিজ্ঞানের সকল শাখায়ই এই জ্ঞান দরকার লাগে. কেননা সঠিক ভাবে জীবটিকে আগে চেনা দরকার। লিনিয়াস্ তাঁর প্রাকৃতিক পদ্ধতি অনুসারে জীবজগতকে কতকগুলি বিভাগ ও পুনর্বিভাগ করে সর্বনিম্ন প্রজাতি (species) পর্যন্ত বিভক্ত করেছেন। এই শ্রেণী বিভাগের একক (Unit) হল প্রজাতি এবং প্রত্যেকটি প্রজাতির একটি বৈশিষ্ট্য সূচক নাম দিয়েছেন।

তিনি সমগ্র জীবজগতকে নিম্নলিখিত বিভাগ ও পুনর্বিভাগে বিভক্ত করেছেন :

জগৎ→পর্ব → শ্রেণী → বর্গ → গোত্র → গণ → প্রজাতি (Kingdom→Phylum→class →Order→Family →Genus→Species)।

প্রতিটি প্রজাতির নামকরণের সময় তিনি দুইটি শব্দ ব্যবহার করেন, প্রথম শব্দটির দ্বারা গণের (Genus) নাম এবং শেষের শব্দটির দ্বারা প্রজাতির (Species) নাম বোঝাতেন। তিনি আমাদের বট গাছের নাম দিয়েছিলেন ফাইকাস্ বেঙ্গালেনসিস্ (Ficus benghalensis). বাংলা দেশে হয় বলে এই নাম। ফাইকাস্ হল এর প্রজাতির (species) নাম। ফাইকাস্ এই গণের আরো অনেক রকম গাছ আছে. কিন্তু ফাইকাস্ বেঙ্গালেনসিস্ বললে শুধু মাত্র বট গাছকেই বোঝাবে অন্য কোন গাছকে নয়। দুইটি পদের সাহায্যে এই নামকরণ হয় বলে একে বলা হয় দ্বি-পদ নামকরণ বা বাইনোমিয়াল নমেনক্লেচার (Binomial nomenclatare)। লিনিয়াস্ ল্যাটিন ভাষায় এইভাবে নানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর নামকরণ করেন, পৃথিবীর সর্বত্র আজও তা ব্যবহৃত হচ্ছে। শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে তাঁর আর একখানি বিখ্যাত বই স্পেসিস্ প্লান্টেরাম ১৬৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর সকল জীবের নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নাম ও শ্রেণী বিভাগ থাকার ফলে আমরা যে সকল সুবিধা পাচ্ছি তা হল : (১) পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে সঠিক উদ্ভিদ ও প্রাণীটিকে চিহ্নিত করা যায়। (২) নূতন, অচেনা কোন জীব চোখে পড়লে তার বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে তাকে সনাক্ত করা যায়। (৩) জীবের ক্রমবিকাশ ও অন্যান্য বহুরকম গবেষণায় এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত জ্ঞান কাজে লাগে।

২৪এ, সার্কুলার গার্ডেনরীচ্ রোড, কলি-২৩

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত
অমর নাথ রায়ের
সংখ্যা নিয়ে খেলা—৫·০০
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা—৫·০০
শৈব্যা ● প্রকাশন বিভাগ ● ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

লেনস্

ডঃ অলক চক্রবর্তী

দুটি তলের দ্বারা বেষ্টিত নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতি বিশিষ্ট কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের ক্ষুদ্র অংশকে লেনস্ বলে। লেনস্-এর পৃষ্ঠ বা তল গোলাকার বা বেলনাকার হতে পারে। সাধারণত লেনস্ কাচ, কোয়ার্টজ, প্লাস্টিক ইত্যাদি দ্বারা তৈরী হয়। আমরা কাচের গোলাকার লেনস্-এর সম্বন্ধে আলোচনা করব।

লেনস্-এর বক্রতল উত্তলও হতে পারে, আবার অবতলও হতে পারে। যে লেনস্-এর মধ্যভাগ উন্নত বা মোটা এবং কিনারা সরু তাকে উত্তল লেনস্ (Convex lens) বলে। আবার যে লেনস্-এর মধ্যভাগ অবতল বা চাপা তাকে অবতল লেনস্ (Concave lens) বলে।

উত্তল ও অবতল লেনস্ তিনরকম হয়। 1নং চিত্রে তিনরকম উত্তল লেনস্ দেখানো হয়েছে। দুটি বক্রতলই যদি উত্তল হয়, তাহলে তাকে উভোত্তল বলে। 2নং

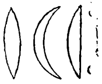

চিত্র-1

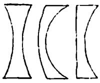

চিত্র-2

চিত্রে তিনরকম অবতল লেনস্ দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রেও দুটি বক্রতলই অবতল হলে ঐ লেনস্‌কে উভাবতল লেনস্ বলে।

যে কোন লেনস্ কয়েকটি প্রিজমের ছোট ছোট টুকরো জোড়া লাগিয়ে তৈরী—এটা কল্পনা করা যেতে পারে।

চিত্র-3 এবং চিত্র-4 একটু ভাল করে দেখলেই লেনসের মধ্যে দিয়ে প্রতিসরণের ব্যাপারটা বোঝা যাবে। আলোক্‌রশ্মি সমান্তরালভাবে আপতিত হলেও বিভিন্ন প্রিজমের জন্য আপতন কোণ বিভিন্ন। তাই প্রতিসরণ কোণও বিভিন্ন হবে। এর ফলে উত্তল লেনসের ক্ষেত্রে সমান্তরাল আলোকরশ্মি যথার্থ একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। কিন্তু অবতল লেনসের ক্ষেত্রে প্রতিসরণের পর আলোক একটি বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়।

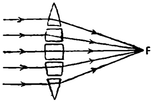

চিত্র-3

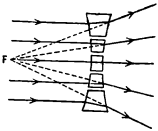

চিত্র-4

লেনস্ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করার আগে আমরা কয়েকটি সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা করি।

উভোত্তল বা উভাবতল লেনসের দুটি বক্রতল আছে। এই বক্রতলগুলি নিশ্চয় কোন গোলকের অংশ। বক্রতলগুলি যে গোলকদ্বয়ের অংশ তাদের কেন্দ্রদ্বয়কে বক্রতা কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধকে বক্রতা ব্যাসার্ধ বলে (চিত্র-5)।

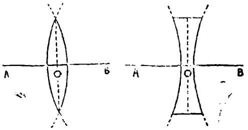

চিত্র-5

বক্রতা কেন্দ্র দুটি যে রেখা দ্বারা যুক্ত সেই রেখাকে প্রধান অক্ষ বলে।

আমরা দুপাশে সমান ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট তলের দ্বারা বেষ্টিত লেনসের কথাই আলোচনা করব। আরও ধরে নেব যে লেনস্‌টি অত্যন্ত পাতলা এবং লেনসের দুপাশে একই মাধ্যম আছে।

লেনসের প্রধান অক্ষে অবস্থিত এমন একটি বিন্দু আছে (5নং চিত্রে O বিন্দু) যে, কোন রশ্মি ঐ বিন্দুর মধ্য দিয়ে গেলে রশ্মিটি সোজাসুজি অর্থাৎ অপরিবর্তিত পথে বার হয়ে যায়।

উত্তল লেনসে প্রধান অক্ষের উপর এমন একটা বিন্দু আছে, যেখান থেকে অপসৃত আলোকরশ্মি লেনসের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে

যায় (চিত্র-6)। অবতল লেনসের ক্ষেত্রে একটি বিন্দু অভিমুখে আগত আলোকরশ্মি প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যায় (চিত্র-7)। উভয় ক্ষেত্রেই বিন্দুটিকে প্রথম প্রধান ফোকাস বলা হয় এবং আলোক-কেন্দ্র থেকে এর দূরত্বকে প্রথম ফোকাস দূরত্ব বলে।

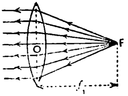

চিত্র-6

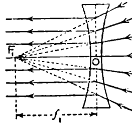

চিত্র-7

আবার যখন উত্তল লেনসে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি আপতিত হয় তখন প্রতিফলনের পরে তারা যথার্থই একটি বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয়। আর অবতল লেনসে সমান্তরাল রশ্মি প্রতিফলনের পর এমনভাবে বেরিয়ে যায় যে মনে হয় প্রতিসৃত রশ্মিগুলি যেন একটি বিন্দু থেকে

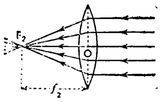

চিত্র-8

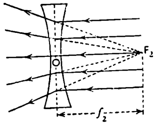

চিত্র-9

আসছে। এই বিন্দুকে লেনসের দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস বলে এবং বিন্দু থেকে লেনস্ কেন্দ্রের দূরত্বকে দ্বিতীয় ফোকাস দূরত্ব বলে (চিত্র-8, 9)।

লেনস্ দ্বারা কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরী হলে, এর আকৃতি অনেক রকম হতে পারে। প্রধান অক্ষের উপর খাড়াভাবে (লম্ব) কোন বস্তু থাকলে প্রতিবিম্বের অবস্থান নির্ণয়ের সময় তিনটি শর্ত মনে রাখতে হবে। যথা :

1. যে আলোকরশ্মি লেনস্-কেন্দ্র দিয়ে যাবে লেনস্-এর মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর, এর পথ অপরিবর্তিত থাকবে।

2. বস্তু থেকে নির্গত আলোক-রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে উত্তল লেনস্-এ প্রতিসৃত হলে, দ্বিতীয় প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে যাবে। আবার অবতল লেনসে সমান্তরাল আলোকরশ্মি প্রতিসৃত হলে, সেটি দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস থেকে অপসৃত বা ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হবে।

3. উত্তল লেনস্-এ প্রথম প্রধান ফোকাস থেকে নির্গত কোন আলোকরশ্মি লেনস্-এ প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হবে। অবতল লেনস্-এ প্রথম প্রধান ফোকাস অভিমুখী কোন আলোকরশ্মি লেনস্-এর মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হবে।

উপরের নিয়মগুলি ব্যবহার করে দু-একটি প্রতিবিম্ব আঁকা যাক।

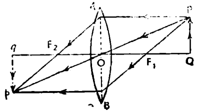

চিত্র-10

10নং চিত্রে PQ বস্তু থেকে PA আলোকরশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে আসছে। তাই প্রতিসরণের পর এটি দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস F_2 দিয়ে AF_2 পথে যাবে। আবার, PO আলোকরশ্মি আলোককেন্দ্র দিয়ে যাচ্ছে বলে অপরিবর্তিত পথে বেরিয়ে যাবে। P বিন্দু থেকে আরও একটি আলোকরশ্মি PF_1 কল্পনা করা যাক্। F_1 হচ্ছে প্রথম প্রধান ফোকাস। আমাদের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিসরণের পর আলোকরশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যাবে। তিনটি প্রতিসৃত রশ্মিই p বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। তাই p হল P-এর প্রতিবিম্ব। এইভাবে PQ-এর প্রতিটি বিন্দুর জন্য প্রতিবিম্ব গঠিত হবে।

অবতল লেনসের একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। 11নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে P বিন্দু থেকে PA আলোকরশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে লেনসে আপতিত হয়েছে। প্রতিসরণের পর আলোকরশ্মি এমনভাবে বেঁকে যাবে যে মনে হবে এটি যেন F_1 বিন্দু থেকে আসছে। তেমনি PO আলোকরশ্মি অপরিবর্তিত পথে সোজা বেরিয়ে যাবে। F_1A এবং PO-এদের ছেদ বিন্দু হবে p, তাই

P বিন্দুর প্রতিবিম্ব p বিন্দুতে গঠিত হয়েছে বলে মনে হবে।

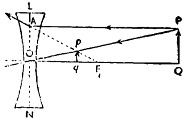

চিত্র-11

আচ্ছা এবার লেনসের ব্যাপারটাকে একটু অন্যরকম করে দেখা যাক্। 12, 13, 14, 15নং চিত্রে আমরা দেখছি যে একটা বাক্সের একপাশে আলোকরশ্মি আপতিত হয়েছে এবং অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাক্সের মধ্যে কি ধরনের লেনস্ আছে, সেটা তোমাকে চিন্তা করে বলতে হবে। উত্তরগুলি না হয় আমিই বলে দিচ্ছি। কিন্তু লেনস্ বসিয়ে ছবি আঁকার দায়িত্ব তোমার। প্রথম বাক্সে (চিত্র-12) একটি উত্তল লেনস্ আছে। দ্বিতীয় বাক্সে (চিত্র-13) একটি অবতল লেনস্ আছে। তৃতীয় বাক্সে (চিত্র-14) প্রথমে অবতল, তারপরে উত্তল লেনস্ আছে। লেনস্ বসিয়ে ঠিক জায়গায় বসিয়ে ছবি আঁকার দায়িত্ব তোমার।

কি ভাবছ? চতুর্থ বাক্সের (চিত্র-15) সম্বন্ধে কিছু বলা হল না? তুমি তো একটু কিছু নিজে থেকেই করবে। তাই 15নং চিত্রের ব্যাপারটি তোমার নিজের কাজ।

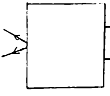

চিত্র-12

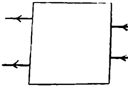

চিত্র-13

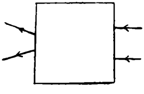

চিত্র-14

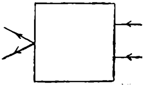

চিত্র-15

পৃথিবীরও কি গ্রহণ হয়?

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

পৃথিবীর আবার গ্রহণ হয় নাকি? চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ—এইত' শুধু জানি। কিন্তু পৃথিবী গ্রহণ! সে আবার কী? তাই না?

ভারী মজা! পৃথিবীর গ্রহণ দেখার ব্যাপারটা। তবে হ্যাঁ। পৃথিবী থেকে তাই বলে কোন দিনই কিন্তু পৃথিবীগ্রহণ দেখা যাবে না। পৃথিবীর গ্রহণ দেখতে হ'লে আমাদের একটা ছোট্ট পাড়ি দিতে হবে চাঁদে। পৃথিবী থেকে যেমন চাঁদ আর সূর্যের গ্রহণ দেখা যায়, চাঁদ থেকেও তেমনি পৃথিবী আর সূর্যের গ্রহণ দেখা যায়।

আমাদের পৃথিবীতে যখন কোনও পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ চলছে, চাঁদে ঠিক তখনই একই সময় ধরে চলছে সূর্যগ্রহণ। পৃথিবীর ছায়ায় চাঁদ ঢাকা পড়ে যায়—তাই পৃথিবীতে দেখা যায় চন্দ্রগ্রহণ। আবার, পৃথিবী সূর্যকে চাঁদের কাছে আড়াল করে রাখে—তাই চাঁদে চলে তখন সূর্যগ্রহণ।

চাঁদের সূর্যগ্রহণ কিন্তু পৃথিবীর সূর্যগ্রহণের মত ক্ষণস্থায়ী নয়। বেশ দীর্ঘস্থায়ী। তা প্রায় চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে। চলবেইত'। আসলে চাঁদের সূর্যগ্রহণ মানে যে আমাদের চন্দ্রগ্রহণ! আমাদের চন্দ্রগ্রহণও ঐ একই মাপের হয় কিনা! অবশ্য, পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই যে একই সময় ধ'রে গ্রহণ দেখা যাবে তার কোনও মানে নেই। কোথাও হয়ত' চার ঘণ্টা দেখা গেল। আবার কোথাও হয়ত' ৪০ মিনিট দেখা গেল। কোথাও হয়ত' দেখাই গেল না।

আসলে, কোথা থেকে গ্রহণ দেখা হ'চ্ছে তার ওপরে সেই জায়গা থেকে কতক্ষণ গ্রহণ দেখা যাবে তা নির্ভর করে। তবে গ্রহণের স্থায়িত্ব পর্যবেক্ষণের জায়গার ওপর নির্ভরশীল নয়। কারণত' জলের মতই সোজা। চন্দ্রগ্রহণের বেলায় চাঁদ যতক্ষণ পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে থাকবে আর সূর্যগ্রহণের বেলায় পৃথিবী যতক্ষণ চাঁদের ছায়ার

মধ্যে থাকবে ততক্ষণইত' গ্রহণ চলবে। কাজেই কোথা থেকে দেখা হ'চ্ছে তার ওপর গ্রহণের মেয়াদ আদৌ নির্ভর করছে না। করবেই বা কেন?

পৃথিবীগ্রহণ কখন দেখা যাবে? কোনও অমাবস্যায় আমাদের পৃথিবীতে যখন সূর্যগ্রহণ চলছে, ঠিক তখনই চাঁদের মাটি থেকে দেখা যাবে পৃথিবীগ্রহণ। চাঁদ তখন সূর্যকে আড়াল করে সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। চাঁদের প্রচ্ছায়া বা উপচ্ছায়া শঙ্কুতে ঢাকা পড়েছে পৃথিবীর কোন কোন জায়গা। সেই ছায়া ঢাকা গ্রহণ খালি চোখে দেখা চাঁদের মানুষের পক্ষে হলঘরে সূঁচ খুঁজে বেড়াবার মতই কষ্টসাধ্য। ছায়াটা খুব ক্ষুদে কিনা, তাই।

কাজটা কঠিন। তবে অসম্ভব নয় মোটেই। এমনকি চৌবাচ্চা কিংবা দুর্গ কিংবা ঘড়ির বেয়াড়া হতচ্ছাড়া অঙ্কগুলোর মতও কঠিন নয়। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, এক্ষুনি একটা দুর্গের, একটা চৌবাচ্চার আর একটা ঘড়ির বেশ ঝামেলা লাগানো অঙ্ক কষে ফেল। তারপর চাঁদে যাবার ব্যাপারে ডজন তিনেক বই হজম করে ফেল।

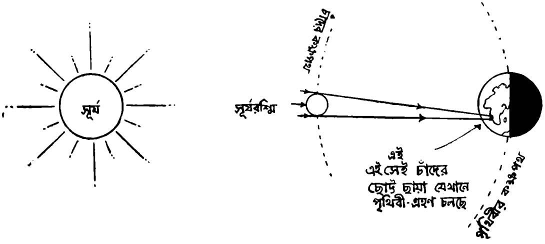

পৃথিবীর গ্রহণ

অঞ্চলের লোকেরা সূর্যকে খানিকটা বা আদৌ দেখতে পাচ্ছেন না। যাঁরা খানিকটা সূর্য দেখতে পাচ্ছেন না— তাঁদের দৃষ্টিতে সেটা আংশিক গ্রাস সূর্যগ্রহণ। যাঁরা সূর্যকে আদৌ দেখতে পাচ্ছেন না—তাঁদের চোখে তখন চলছে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ।

এদিকে চাঁদের ছায়ার ছোট্ট যে বৃত্তটা পৃথিবীর গায়ের ওপর দিয়ে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে যায় সে বৃত্তটাকে চাঁদের দর্শক তখন দেখছেন একটা ঘনকালো চাকতি। সেই অন্ধকার চাকতিটা যতক্ষণ পৃথিবীর ওপর দিয়ে চলছে তখন তাঁর দৃষ্টিতে রূপোলী পৃথিবীর বুকে রাহুগ্রাস চলছে। চাঁদ যদি আমাদের সোনার থালা। পৃথিবী তবে চাঁদের মানুষের কাছে ঐ সোনালী থালার চারগুণ বড় এক রূপোলী থালা। সেই চকচকে থালার ওপর দিয়ে চাঁদের ছোট্ট ছায়া-বৃত্তটা যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতে থাকে তখনই পৃথিবীগ্রহণও চলতে থাকে। তবে সে সময়জিৎ করের 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' বইটা অবশ্যই প'ড়ো। ব্যস্! এবার একদিন সোঁ করে চলে যাও চাঁদে। সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর বুকে চাঁদের ছায়াটা খুঁজো। তখন নিজেই বুঝতে পারবে কোন্‌টা সোজা—পৃথিবীগ্রহণ দেখা, নাকি দুর্গ-চৌবাচ্চা-ঘড়ির নচ্ছার অঙ্কগুলোকে শায়েস্তা করা। আর আমাকে আগেভাগে জানিও কিন্তু। চাঁদে আমার মামার বাড়ি কিনা! সেখানেই তোমাদের সকলের বিনি পয়সায় থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত হ'য়ে যাবে। রকেটের টিকিট? দুর্গ-চৌবাচ্চা-ঘড়ির সব অঙ্ক যে পারে তার আবার টিকিট কী? তার সবই ফ্রী। কবে যাচ্ছো?

৪, জ্ঞানেন্দ্র এ্যাভিন্যু, উত্তরপাড়া, হুগলী।
৭১২-২৫৮

অনীশ দেব

কিউব দিয়ে কত নকশা তৈরী করা সম্ভব

রুবিক কিউবের ভেতরের রহস্য ফাঁস হয়ে যাবার পর এবারে বাইরের রহস্য নিয়ে কিছুটা সময় কাটানো যাক। রুবিক কিউব যখন 'প্যারিপাটি' অবস্থায় রয়েছে, অর্থাৎ তার প্রত্যেক পিঠের ন'টা ক্ষুদে কিউবের রঙই এক রকম, তখন আমরা বলবো সেটা কিউবের আদি অবস্থা। এই অবস্থা থেকে কিউবের নানান থাকে মোচড় দিয়ে তৈরী করতে হয় নতুন নতুন নকশা।

যদি আমরা হিসেব করতে চাই রুবিক কিউবের ছাব্বিশটা ক্ষুদে কিউব কতরকমভাবে সাজানো যায়, তাহলে আমাদের মুখোমুখি হতে হবে এক প্রকাণ্ড সংখ্যার—যা কল্পনা করতেও অবাক লাগে।

বিজ্ঞানের উন্মেষের প্রাচীনকালে, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিদিস একবার হিসেব করেছিলেন, গোটা ব্রহ্মাণ্ড ভর্তি করে ফেলতে যতো বালি লাগবে, তাতে মোট বালির কণার সংখ্যা কত। অনেক অঙ্ক কষে তিনি উত্তরটি বের করেছিলেন : 10^{63}, অর্থাৎ 1 সংখ্যাটির পর 63 টা শূন্য বসিয়ে যে বিশাল সংখ্যা পাওয়া যায়।

ব্রহ্মাণ্ডের যে আকার বর্তমানে কল্পনা করা গেছে, তাতে আজ যদি আর্কিমিদিস বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁর উত্তর হতো 10^{100} বা তার চেয়েও কিছু বেশী। এই প্রসঙ্গে বলি, আমাদের মহাবিশ্বে মোট পরমাণুর সংখ্যা কিন্তু 3×10^{74}।

রুবিক কিউবে তৈরী মোট নকশার সংখ্যা (সুষম, বিষম সবরকম নকশার চেহারা নির্বিচারে ধরে) এতো বেশী না হলেও নেহাৎ কম নয় : প্রায় 5×10^{20}, বা একুশটি অঙ্কের এক বিরাট সংখ্যা। বিন্যাস পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে বেশ সহজেই এই সংখ্যাটি হিসেব করে বের করা যায়।

প্রথমে ধরা যাক, আমাদের কাছে এক প্যাকেট তাস, অর্থাৎ 52 টি তাস রয়েছে, এবং এই 52 টি তাস রাখার জন্য 52 টি ছোট ছোট বাক্স রাখা আছে। হাতের প্যাকেটের প্রথম তাসটিকে 52 টি বাক্সের যে কোন একটিতে রাখা যায় ; অর্থাৎ, 52 ভাবে রাখা যায়। ফলে প্রথম তাসটিকে কোন একটি বাক্সে রাখলেই আর বাকি থাকে 51 টি খালি বাক্স। সুতরাং দ্বিতীয় তাসটিকে রাখা যাবে 51 ভাবে। তার পরেরটি 50 ভাবে। এই রকম করে ধাপে ধাপে এগোলে দেখা যাবে, শেষের আগের তাসটি রাখার সময় খালি থাকবে থাকবে 2 টি বাক্স, এবং শেষ তাসটির জন্য মাত্র একটি। অতএব 52টি তাসকে 52 টি খালি বাক্সে রাখা যাবে, $52 \times 51 \times 50 \times 49 \ldots\ldots \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 8 \times 10^{67}$ (প্রায়) রকম ভাবে। এই সংখ্যাকে সংক্ষেপে বলা হয়, ক্রমগুণিত 52 বা 52 !—যা কিনা 52 টি তাসের বিন্যাস সংখ্যা।

রুবিক কিউবে 'কোণের ক্ষুদে কিউব' মোট আটটি, এবং তাদের থাকার জায়গাও ঐ আটটি কোণ। সুতরাং একই নিয়মে তাদের মোট বিন্যাসের সংখ্যা 8 !, অর্থাৎ, সেগুলোকে 40320 ভাবে সাজানো যায়। এই প্রত্যেকটি 'কোণের ক্ষুদে কিউব' এর বিভিন্ন রঙের তিনটে পিঠ দেখা যায়। সুতরাং, কোন একটি 'কোণের ক্ষুদে কিউব' আটটি কোণের যে কোন একটি কোণে, তিনভাবে ঘুরে বসতে পারে (যেহেতু তার তিনটে রঙীন পিঠ আছে), সুতরাং একটু আগে হিসেব করা বিন্যাসের সংখ্যা, 8 ! কে 3 দিয়ে গুণ করতে হবে। কিন্তু মোট আটটি 'কোণের ক্ষুদে কিউব' থাকায়, ওদের বিন্যাসের মোট সংখ্যা দাঁড়াবে,

$$8! \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 8! \times 3^{8}$$

এবারে 'পাশের ক্ষুদে কিউব' এর পালা। এদের মোট দুটো রঙীন পিঠ। সংখ্যা 12, এবং বসার জায়গাও 12 টি। সুতরাং একইভাবে, এই ক্ষুদে কিউবগুলোকে সাজানো যেতে পারে, $12! \times 2^{12}$ ভাবে।

কেন্দ্রের ক্ষুদে কিউব ছ'টা যে জায়গা ছেড়ে নড়তে পারে না সেটা তো আগেই দেখানো হয়েছে। ফলে নকশা তৈরীর ব্যাপারে ওরা রুবিক কিউবকে কোন রকম সাহায্য করতে পারছে না—একমাত্র নিজের নিজের জায়গায় হাজির থাকা ছাড়া। সুতরাং রুবিক কিউবে মোট যে নকশার সংখ্যা পাওয়া যায়, তা হলো,

$(8! \times 3^8) \times (12! \times 2^{12}) = 519, 024, 039, 293, 878, 272, 000 = 5 \times 10^{20}$ (প্রায়)

বিন্যাস পদ্ধতির কয়েকটি বিধিনিষেধ থাকায়, এতোগুলো নকশা রুবিক কিউবে পাওয়া যায় না। আসল সংখ্যাটি হলো ওপরের সুবিশাল সংখ্যার 12 ভাগের এক ভাগ—অর্থাৎ, 43, 252, 003, 274, 489, 856, 000 = 4×10^{19} (প্রায়)

সুতরাং 'পরিপাটি' অবস্থা থেকে শুরু করে মোট 4×10^{19} রকম নকশা আমরা পেতে পারি। কিন্তু দেখা গেছে, রুবিক কিউবের আরো এগারো রকম শুরুর 'অবস্থা' আছে যা থেকে আরও এগারো সেট 4×10^{19} রকম নতুন নতুন নকশা পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ, প্রতি সেট-এ 4×10^{19} করে মোট 12 সেট নকশা পাওয়া যায়। এক-একটি সেটের কোন নকশা থেকে কিন্তু অন্য কোন সেটের কোন নকশাই পাওয়া সম্ভব নয়। তার আসল অর্থ হলো, প্রত্যেকটি সেট স্বতন্ত্র। প্রকৃত পক্ষে এই সেটগুলোকে বলা হয় এক একটি 'কক্ষ'। ভাবতে কি আশ্চর্য লাগে না যে এই 12 টি 'কক্ষ'পথের প্রত্যেকটিতে লুকিয়ে রয়েছে 4×10^{19} রকম নকশা।

এই কারণেই ক্ষুদে কিউবগুলো খুলে আবার জোড়া দেবার সময় একটা জিনিস মনে রাখতে হবে। সেটা হলো, জোড়া দিয়ে যেন কিউবের 'পরিপাটি' অবস্থা তৈরী হয়। নইলে এমন এক বেয়াড়া নকশা তৈরী হবে যা থেকে আর কোনদিনই 'পরিপাটি' অবস্থায় ফিরে আসা যাবে না। অর্থাৎ, কিউবের নকশাগুলো 'পরিপাটি' অবস্থার সেট বা কক্ষ ছেড়ে অন্য এগারোটি কক্ষের কোন একটায় চলে যাবে।

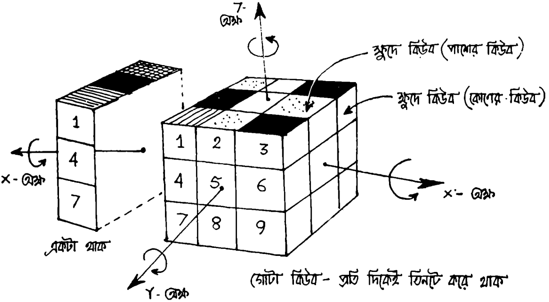

চিত্র -1

মজার কিউব ও তার একটা উল্লম্ব থাক-কে খুলে দেখানো হয়েছে। থাকগুলো X, Y, ও Z-অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরতে পারে।

সুষম নকশা তৈরীর পদ্ধতি

সুষম নকশা আমরা কাকে বলবো? যখন রুবিক কিউবের প্রত্যেক পিঠে রঙের নকশার মধ্যে এক ধরনের প্রতিসাম্য থাকবে, তখনই আমরা সেটাকে একটা সম্পূর্ণ সুষম নকশা বলে দাবী করবো। কিউবের 'পরিপাটি' অবস্থা থেকে সুষম নকশা তৈরী করাটা খুব সহজ, কিন্তু সেখান থেকে কিউবের চেহারাকে 'পরিপাটি' অবস্থায়

ফিরিয়ে নিয়ে আসা খুব কঠিন। কারণ, কোন্ কোন্ থাক ঘুরিয়ে নকশাটি তৈরী করা হয়েছে সেটা ঠিক মতো মনে রাখতে না পারলেই ভুলভাল দিশেহারা মোচড়ে কিউবটা 'ছত্রখান' হয়ে যাবে। সোজা কথায়, বাড়ী থেকে রওনা হয়ে যেন মাঝ পথে পথ হারিয়ে ফেলা। তারপর 'ছত্রখান' অবস্থা থেকে 'পরিপাটি' অবস্থায় ফিরিয়ে আনাটাই সবচেয়ে দুরূহ সমস্যা—যে সমস্যা সমাধান করতে অধ্যাপক আর্নো রুবিকেরই দু-সপ্তাহ লেগে গিয়েছিলো।

কিউব দিয়ে নকশা তৈরী করতে গেলে তার ছ'-ছ'টা পিঠকে প্রথমেই আমাদের নিখুঁতভাবে চিনে নিতে হবে। প্রত্যেক পিঠের কেন্দ্রের ক্ষুদে কিউবটা (চিত্র-1-এর 5নং ক্ষুদে স্ক্রু উপাট) যেহেতু জায়গা ছেড়ে নড়তে পারে না সেহেতু তার রঙ দেখেই সেই পিঠটাকে চিনে রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে।

রুবিক কিউবের যে কোন একটা পিঠ যদি আমাদের চোখের সামনে ধরে কিউবটাকে স্থির রাখা হয়, তাহলে প্রত্যেকটা পিঠের আমরা এক একটা নাম দিয়ে নিতে পারি। চোখের সামনে যে পিঠটা রয়েছে তার নাম মনে করি F, ডানদিকের পিঠ হলো R, বাঁ দিকের পিঠ L, ওপরের অনুভূমিক পিঠটা U, পেছন দিকের পিঠের নাম B এবং একেবারে নীচে যে পিঠটা রয়েছে তার নাম মনে করা যাক D। চিত্র—2ঘ দেখলেই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে। ছবিতে B, L ও D, এই তিনটে পিঠ দেখা যাচ্ছে না। ছ'টা পিঠের যেহেতু নামকরণের পালা শেষ, আমাদের কাজও অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে। এবার রুবিক কিউবের এই পিঠগুলোকে, অর্থাৎ থাকগুলোকে, যেভাবে মোচড় দেবো সেটা আমরা একটা নির্দ্দিষ্ট সংকেত দিয়ে প্রকাশ করবো।

যে কোন একটা থাককে আমরা দু দিকে ঘোরাতে পারি। ডান দিকে, অথবা বাঁদিকে। 2ক নং ছবিতে তিনটে পিঠের থাকই ডান দিকে ঘুরছে বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এর উল্টোটাও সম্ভব। যেটাকে আমরা 'ডান দিকে ঘুরছে' বলছি, সেটা হলো ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে, সেই দিক—অর্থাৎ, পরিভাষায় 'দক্ষিণাবর্ত'। একই ভাবে, ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘুরলে আমরা বলবো, 'বামাবর্ত'।

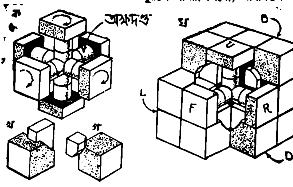

চিত্র—2: (ক) কেন্দ্রের ছ'টি ক্ষুদে কিউব (খ) 'পাশের' ক্ষুদে কিউব (গ) 'কোণের' ক্ষুদে কিউব (ঘ) কিউবের কয়েকটি ক্ষুদে কিউব খুলে ফেলা হয়েছে।

রুবিক কিউবের সামনের পিঠটাকে (F) ডান দিকে 90° ঘোরালে, সেটাকে আমরা সংক্ষেপে শুধু F অক্ষরটা দিয়ে প্রকাশ করবো। যদি বাঁ দিকে 90°-র ঘোরাই, তাহলে লিখবো F'। 90°-র বদলে যদি ডানদিকে 180° ঘোরাই, তাহলে লিখবো, F^2। 270° ঘুরলে বলবো, F^3। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, F^3 এর অর্থ, F পিঠটাকে প্রথম অবস্থা থেকে বাঁ দিকে 90° ঘোরানো, অর্থাৎ F'। সুতরাং, আমরা বলতে পারি, $F^3 = F'$। একইভাবে, F পিঠকে যে কোন দিকে 360° ঘোরালে,

দৃষ্টিহীনদের জন্য রুবিক কিউব

আমরা বেশীরভাগ মানুষই চোখে দেখতে পাই, ফলে আমাদের মুগ্ধ করতে রুবিক কিউবের বেশী সময় লাগে না। কিন্তু যাঁরা অন্ধ কোন না কোন কারণে হারিয়েছেন দৃষ্টিশক্তি, তাঁরা কি বঞ্চিত হবেন রুবিক কিউবের নেশা থেকে? নিশ্চয়ই না। এই সমস্যার সমাধানে একটা কিউব ডিজাইন আমার মাথায় এসেছে, যাকে আমি নাম দিয়েছি, "ব্রেইল রুবিক কিউব"। "ব্রেইল" পদ্ধতি হচ্ছে দৃষ্টিহীনদের অক্ষর পরিচয় করানোর সুপরিচিত পদ্ধতি।

এই নতুন ডিজাইনে রুবিক কিউবের ছ'টা পিঠে ছটা রঙ লাগানোর বদলে ছ'রকম খোদাই করা চিহ্ন থাকবে। যেমন ধরা যাক এক নম্বর পিঠের নটা ক্ষুদে কিউবের ওপরেই একটি করে ছোট্ট প্লাস্টিকের দানা আঁকানো থাকবে। দু-নম্বর পিঠের নটা ক্ষুদে কিউবের প্রত্যেকটির ওপরে থাকবে দুটো করে দানা। এইভাবে ছ'নম্বর পিঠের প্রত্যেকটি ক্ষুদে কিউবের ওপরে থাকবে ছ'-ছ'টি করে দানা। এই দানাগুলো আঙুলে অনুভব করেই দৃষ্টিহীনেরা বুঝতে পারবেন, কোন্ ক্ষুদে কিউবটা কোন্ পিঠে আসবে।

সম্প্রতি আতঙ্কগ্রস্ত প্রতিবন্ধী বর্ষের কথা মনে রেখে কোন ভারতীয় কিউব কোম্পানী এই "ব্রেইল রুবিক কিউব" তৈরীর কথা ভাবতে পারেন।

পিঠটা আগের অবস্থাতেই ফিরে আসে। অর্থাৎ, F^4 (চারটে 90°-এর মোচড়) মোচড়ের ফলাফল শূন্য। আবার, $F^2 = (F')^2$, কারণ থাকটা ডানদিক কিংবা বাঁদিকে ঘুরছে 180°। যার ফলাফল একই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কিউবের প্রত্যেকটি থাক কিভাবে কোন্ দিকে ঘুরছে, সেটা আমরা লিখে প্রকাশ করতে পারি। এই প্রকাশভঙ্গী যিনি প্রবর্তন করেছেন, তিনি হলেন অধ্যাপক ডেভিড সিঙমাস্টার।

মোচড় দেবার এই পদ্ধতিটাকে দু-একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা খানিকটা সরগর করে নিতে পারি। যেমন, U^2LF', এই সংকেতের অর্থ কি? প্রথমেই রয়েছে, U^2, যার অর্থ, কিউবের ওপরের থাকটাকে (U) দক্ষিণাবর্তভাবে 180° পাক দেওয়া। তারপর, L—যার অর্থ, বাঁ দিকের থাকটাকে দক্ষিণাবর্ত 90° পাক দেওয়া। আর সর্বশেষ অক্ষর F′ এর অর্থ সামনের থাককে বামাবর্ত 90° মোচড় দেওয়া। সুতরাং U^2LF' এই শব্দটি লিখে আমরা অনেকগুলো মোচড়ের ফলাফলকে সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পেরেছি।

এবারে আমরা সুষম নকশা তৈরী শুরু করবো। তার জন্য দরকার একটা 'পরিপাটি' রুবিক কিউব—যার ছ'দিকে ছ'টা রঙ রয়েছে ; অর্থাৎ, কোন পিঠেই দুটো বিভি রঙের মিশেল নেই। এখন কিউবটার বিভিন্ন থাকে মোচড় দিলে তৈরী হবে নকশা। তবে একটা নকশা তৈরীর পর, আবার আমাদের 'পরিপাটি' অবস্থায় ফিরতে হবে। তার জন্য, নকশা তৈরীর সময় ঠিক যে রকম ভাবে বিভিন্ন মোচড় দেওয়া হয়েছিলো, তার ঠিক উল্টো মোচড়গুলো দিয়ে আমাদের ফিরতে হবে। যদি 'পরিপাটি' কিউবে আমরা UF^2LDB এই মোচড়গুলো দিই, তাহলে আবার 'পরিপাটি' অবস্থায় ফিরতে গেলে B′D′L′-R′F′U′ এই মোচড়গুলো দিতে হবে। কারণটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে : ফেরার সময় মোচড়গুলো শুরু করতে হবে শেষ থেকে, এবং সেগুলো দিতে হবে উল্টো দিকে। ফলে আমরা B′ মোচড় দিয়ে ফেরার পথে যাত্রা শুরু করেছি। সেইজন্যেই সুবিধে হচ্ছে, 'পরিপাটি' অবস্থা থেকে নকশার দিকে এগোনোর সময় মোচড়ের প্রতিটি ধাপ লিখে রাখা, নইলে পথ হারাতে দেরী হবে না। পরে অবশ্য মোচড়গুলো রপ্ত হয়ে গেলে লিখে রাখার আর প্রয়োজন হবে না। রুবিক কিউবকে রপ্ত করার জন্য কয়েকটা নকশা তৈরীর সংকেত দেওয়া হলো। সংকেতে বন্ধনী চিহ্নগুলো নেহাতই লেখার সুবিধের জন্যে দেওয়া হয়েছে :

(1) UB (LR′) U′F′, (2) FR′BL′, (3) (U′D) F (UD′) L′ (4) (FUFUFU) (F′U′-F′U′F′U′)F^2, (5) (DR^2) ($D'L^2$) F^2 B^2

রুবিক কিউবের অন্যান্য আবিষ্কারক

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে টোকিওর জনৈক ইঞ্জিনিয়ার তেরুতোশি ইশিগি রুবিক-কিউব আবিষ্কার করেন—তবে আর্নো রুবিকের একবছর পরে। 1976 সালে কিউবটার পেটেন্ট নেন ইশিগি।

এছাড়া ফ্রান্সের সরকারী সূত্রে শোনা গেছে 1920 সালে ইস্তাম্বুলে এবং 1935-এ মার্সেইলিতে এজাতীয় কাঠের কিউব নাকি প্রচলিত ছিলো, যদিও এই খবরের ভিত্তিতে কোন প্রমাণ দাখিল করা হয়নি।

একেবারে সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, আমেরিকার 'মলিকিউলন' রিসার্চ কর্পোরেশনের' কর্মী ল্যারি নিকোলস নাকি রুবিক কিউব তৈরী করে তার পেটেন্ট নিয়েছিলেন 1972 সালে। এই কারণে 'মলিকিউলন…' 'আইডিয়াল টয় কর্পোরেশনের' বিরুদ্ধে ছ'কোটি ডলার ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেছে। ফলাফল এখনও জানা যায়নি।

এই সংকেতগুলো হাতেনাতে পরীক্ষা করার সময় কোন্ ক্ষুদে কিউবটা কোন্ মোচড়ের ফলে কোথায় যাচ্ছে সেটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাবে। আর ক্ষুদে কিউবের প্রত্যেকটাকে যেভাবেই হোক চিনে নিতে হবে নিখুঁত ভাবে। একমাত্র তখনই রুবিক কিউব হার স্বীকার করবে আমাদের বুদ্ধির কাছে।

পথ হারা তুমি পথিক……

সবচেয়ে সমস্যা-সঙ্কুল অংশে এবারে আমরা ঝাঁপ দেবো। হ্যাঁ পথভ্রান্তি ও তার প্রতিকারের উপায়।

নকশা তৈরীতে দক্ষতা অর্জন করতে পারলে রুবিক কিউবের প্রত্যেকটা ক্ষুদে কিউবকে বেশ হাড়ে হাড়ে চেনা হয়ে যাবে। তখন কিছুটা পর্যবেক্ষণ, কিছুটা বুদ্ধি আর ষষ্ঠেন্দ্রিয় ভরসা করে রুবিক কিউবকে 'ছত্রখান' অবস্থা থেকে 'পরিপাটি অবস্থায় নিয়ে আসা বোধহয় তেমন কষ্টকর হবে না। এই সমস্যার সমাধান করতে প্রথমবারে কোন মানুষের যে সময় লাগে, সেটা গড়ে দু-সপ্তাহ থেকে একবছর পর্যন্ত। তারপর রপ্ত হয়ে গেলে সময় ক্রমে কমে আসে।

এই নিয়েই পৃথিবীর বহু দেশে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে—কে কতো তাড়াতাড়ি কিউবকে 'পরিপাটি' অবস্থায় নিয়ে আসতে পারে।

সমাধানের বিভিন্ন রেকর্ড

১। ফ্রান্সের ক্রীড়া সাংবাদিক, পঁচিশ বছর বয়েসী জেরোম জঁা-চার্লস—সময় লাগে গড়ে 32 সেকেণ্ড।

২। ইংল্যাণ্ডের ষোলো বছরের কিশোর, নিকোলাস হ্যামণ্ড — সময়, 40 সেকেণ্ড

৩। ইংল্যাণ্ডের তেরো বছরের কিশোর, প্যাট্রিক বসার্ট — সময় 90 সেকেণ্ড।

৪। কলকাতার ছ'বছরের ছোট্ট মেয়ে, অপরাজিতা গুহ — সময়, 300 সেকেণ্ডের কিছু কম।

৫। আমেরিকা নিবাসী ষোল বছরের ভিয়েতনামী মেয়ে মিঞ্চ থাই, সময় লাগে 23 সেকেণ্ড।

যেহেতু রুবিক কিউবে প্রায় অসংখ্য নকশা তৈরী করা যায়, সেহেতু 'কিউব সমাধানের' কোন নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা সম্ভব নয়; বরং কয়েকটা সাধারণ পদ্ধতির কথা বলা যেতে পারে। অনেকেই নানারকম নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করে নিয়েছেন সমাধানের জন্য, কিন্তু সাধারণ নিয়মগুলোও যথেষ্ট জনপ্রিয়। তারই একটার প্রথম ধাপ হচ্ছে, যে কোন একটা থাকের রঙগুলো ঠিকমতো মেলানো।

দ্বিতীয় ধাপ: মাঝের থাকের চারটে ক্ষুদে 'পাশের কিউব' এর রঙ মেলানো—কারণ এই থাকের বাকি ছ'টা ক্ষুদে কিউব হলো কেন্দ্রের ক্ষুদে কিউব, যারা জায়গা ছেড়ে নড়তে পারে না।

তৃতীয় ধাপ: একেবারে নীচের থাকের আটটা ক্ষুদে কিউবের রঙ মেলানো।

এই তিনটে ধাপ শেষ করতে যে পরিশ্রম হয়, তার প্রায় শতকরা সত্তর ভাগ খরচ হয়ে যায় শুধু শেষ ধাপটুকুর জন্য। তবে, এই নিয়মে সমাধানের পথে এগোনোর ব্যাপারটা ধাপে ধাপে স্বচক্ষে দেখা যায়। দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপ করার সময় প্রথম ধাপে তৈরী হওয়া সমাধানের অংশটুকু কিছুটা ওলট-পালট হয়ে যাবে। পরে সেটা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে সময় মতো।

আর একটা নিয়মে, প্রথম ধাপ: ওপরের থাকের ক্ষুদে 'পাশের কিউবগুলো'কে জায়গা মতো নিয়ে আসা। দ্বিতীয় ধাপ: ওপরের থাকের ক্ষুদে 'কোণের কিউবগুলো'র রঙ মেলানো। তৃতীয় ধাপ: নীচের থাকের ক্ষুদে 'কোণের কিউব'। চতুর্থ ধাপ: মাঝের থাকের ক্ষুদে, 'পাশের কিউব' এবং পঞ্চম ও শেষ ধাপ: নীচের থাকের ক্ষুদে 'পাশের কিউব'গুলোর রঙ মেলানো।

এই পাঁচটা ধাপের রকমফের করেও অনেকে রুবিক কিউব সমাধান করেন।

প্রথম প্রথম রুবিক কিউবের সমাধান করতে কয়েকশো মোচড় দিতে হয়। পরে এই সংখ্যা কমে কমে আশি-নব্বইতে এসে দাঁড়ায়। ডেভিড সিঙমাস্টার-এর জনৈক সহকর্মী মরওয়েন বি. থিসলথোয়েইট কম্পিউটারের সাহায্যে বের করেছেন যে মাত্র 52টা মোচড় দিয়েই 'ছত্রখান' রুবিক কিউবকে 'পরিপাটি' অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব। এম. আই. টি. বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিড ক্রাইস্টম্যান ও 'সিম্বলিক্স ইনকর্পোরেটেড'-এর বার্ণার্ড গ্রীণবার্গ কম্পিউটার গ্রাফিক পদ্ধতিতে কম্পিউটারের টি ভি পর্দায় (ক্যাথোডরে টিউবে) রুবিক কিউবের ছবি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এই কম্পিউটারটি একটি 'লিস্প্ মেসিন'। এবং এর প্রোগ্রাম পরিবর্তন করে রুবিক কিউবের যে কোন পিঠের ছবি দেখা সম্ভব, ক্ষুদে কিউবগুলোর যে কোন পরিবর্তন করা সম্ভব।

রুবিক কিউবের সমাধান নিয়ে বিদেশে বহু প্রতিযোগিতা হয়েছে এবং হচ্ছে। ভারতবর্ষও এখন খুব একটা পিছিয়ে নেই। বোম্বাইয়ের 'টয়টয়' কোম্পানী ইদানীং প্রতিযোগিতার কথা ভাবছে—যাতে বিজয়ীকে দেওয়া হবে 5000 টাকার পুরস্কার।

রুবিক কিউবের রকমফের

রুবিক কিউবের সমস্যাকে সহজ করে তোলার জন্য ইউরোপে-আমেরিকায় সম্প্রতি কিছু অদ্ভুত রঙের কিউব চালু হয়েছে। যেমন, কোন কিউবের তিনটে পিঠে একই রকম রঙ। ফলে মোট রঙের সংখ্যা চার। আবার কোন কিউবের পাঁচটা পিঠই এক রংয়ের, বাকি পিঠটায় লাগানো রয়েছে ভিন্ন দ্বিতীয় রঙটি। অনেক জায়গায় $2\times2\times2$ কিউবের প্রচলন হয়েছে। অর্থাৎ এই ছোট কিউবের পিঠে ন'টা ক্ষুদে কিউবের বদলে থাকে মাত্র চারটে করে ক্ষুদে কিউব। আর মোট ক্ষুদে কিউবের সংখ্যা আট। এই কিউবে মোট $8!\times3^7$ সংখ্যক নকশা তৈরী করা সম্ভব। যদি রুবিক কিউবের আটটা 'কোণের ক্ষুদে কিউব' খুলে নিয়ে আলাদা-

ভাবে জোড়া দেওয়া যায়, তাহলেই তৈরী হয়ে যাবে $2\times2\times2$ কিউব। তবে এই কিউবের যান্ত্রিক গঠন হয়তো রুবিক কিউবের মতো হবে না। আমার নিজের পরিকল্পনা করা একটা গঠন পদ্ধতি চিত্র-3 এ দেখানো হলো। এতে আটটা ক্ষুদে কিউবকে নমনীয় প্লাস্টিকের ছাঁচে ঢালাই করে তৈরী করতে হবে। তারপর ঠিক মতো চেপে লাগিয়ে দিলেই ক্ষুদে কিউবের থাকগুলো রুবিক কিউবের মতোই ঘুরতে পারবে স্বচ্ছন্দে।

চিত্র-3 এ def তল বরাবর যে শিরা ও খাঁজ দেখানো হয়েছে, ঠিক একই রকম গঠন হতে হবে abc ও xyz তলের। ফলে প্রতিটি ক্ষুদে কিউবের যে তিনটে পিঠ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সেই তিনটে পিঠেই থাকবে শিরা অথবা খাঁজের এক চতুর্থাংশ। অর্থাৎ, চারটে ক্ষুদে কিউব পাশাপাশি

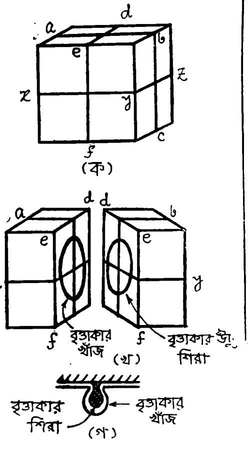

চিত্র—3 : (ক) $2\times2\times2$ রুবিক কিউব বা কিউব 'জুনিয়ার'। (খ) যান্ত্রিক গঠন। abc এবং xyz তলেও একই রকম শিরা ও খাঁজ রয়েছে। (গ) খাঁজের ওপর রেখে শিরাকে চাপ দিলেই শিরা ও খাঁজ পরস্পরের নিযুক্ত হয়ে যাবে।

রাখলেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ হবে। প্রত্যেকটি ক্ষুদে কিউবকে পরস্পরের গায়ে চাপ দিয়ে আটকে দেওয়া যাবে। আবার প্রয়োজনে তাদের খুলেও ফেলা যাবে রুবিক কিউবের মতো। রুবিক কিউবের সমাধান খুব কঠিন মনে হলে এই $2\times2\times2$ কিউব 'জুনিয়ার' নিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

আরও একধরনের $4\times4\times4$ কিউব বিদেশে চালু হয়েছে বলে জানা গেছে। এগুলোর সমাধান নিঃসন্দেহে $3\times3\times3$ কিউবের চেয়ে আরও জটিল, কারণ এতে সম্ভাব্য নকশার সংখ্যা রুবিক কিউবের চেয়ে অনেক গুণ বেশী।

জিগ্‌স্য-রুবিক কিউব

এই কিউবের ডিজাইনটা আমি সেই সব বুদ্ধিমানদের জন্য ভেবেছি যারা চটপট রুবিক কিউবের সমাধান করে ফেলতে পারছেন। রুবিক কিউবের 'পরিপাটি' অবস্থায় আমরা ছ'দিকে ছ'টা ভিন্ন রঙ দেখতে পাই (যেটা আবার ন'টা একই রংয়ের ক্ষুদে কিউবের সমষ্টি)। কিন্তু এই জিগ্‌স্য-রুবিক কিউবে 'পরিপাটি' অবস্থায় দেখা যাবে ছ'পিঠে ছ'টা সুন্দর সুন্দর ছবি—নিসর্গ দৃশ্য হলেই ভালো হয়। এই বার যদি হরেকরকম মোচড় দিয়ে ক্ষুদে কিউবগুলোকে জট পাকিয়ে কিউবটাকে 'ছত্রখান' করে ফেলি, তাহলে ছ'টা নিসর্গ দৃশ্যই (এখানে মনে রাখা দরকার, প্রত্যেক পিঠের নিসর্গদৃশ্যটি ন'টা ক্ষুদে কিউবের টুকরো ছবি জুড়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছিলো) ছড়িয়ে ছিটিয়ে একে অপরে মিলে মিশে নয়ছয় হয়ে যাবে। এই 'ছত্রখান' অবস্থা থেকে কিউবে ঠিকমতো মোচড় দিয়ে ছ'টা পিঠের ছ'টা ছবিকে ঠিকমতো উদ্ধার করাটা বোধহয় রুবিক কিউব সমাধানের চেয়েও হাজার গুণ কঠিন। তবে সুবিধের জন্য, নিসর্গ দৃশ্যগুলোর ছ'টা ছাপা ছবি জিগ্‌স্য-রুবিক কিউবের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হবে। রুবিক কিউবে ক্ষুদে কিউবের রঙ দেখে তাকে চিনতে হয়, সে কোন্ পিঠে যাবে। এই বিচিত্র কিউবের ক্ষেত্রে ক্ষুদে কিউবের ছোট্ট টুকরো ছবি দেখে তাকে চিনতে হবে। ব্যাপারটা অনেকটা টুকরো-ছবির-ধাঁধার মতো, তবে তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন, তাই না?

এর শেষ কোথায়

কিউবের নেশার শেষ কোথায় তা কেউ বলতে পারে না। এই সংক্রামক কিউব-ব্যাধিতে আমরা আক্রান্ত হই ক্ষতি নেই, কিন্তু এই কিউবের মধ্যে নিহিত যুক্তি-অঙ্ক-বিজ্ঞান ইত্যাদিকে যেন পুরোপুরি অবহেলা না করি। তাহলেই দেখা যাবে, নিছক নেশার বদলে কিউব-চর্চা বুদ্ধিতে শান দেবার এক মস্ত হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফলিতপদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলকাতা-৯

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা'র আগষ্ট, '৮২ সংখ্যার দশ বা তার বেশী সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

কলকাতা : নুপুর চক্রবর্তী, শেখর চক্রবর্তী, পুলক দাস, শবরী মজুমদার, নিশাদ চৌধুরী. শুভাশিষ আতর্থী দুর্গা মাথুর, দিব্যেন্দু পাণিগ্রাহী, জয়দেব বসাক, অরূপ কুমার পাল, কল্লোল দে, শ্যামল বণিক, অদ্রিজাকুমার দত্ত, মিতা মণ্ডল, রমা মণ্ডল, সুচন্দ্র আদক. স্বরূপকুমার চ্যাটার্জী, প্রণবকুমার সরকার, তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবাশীষ রায়চৌধুরী, জয়দেব ঘোষাল. মলয় দাস. শশাঙ্ক শেখর দাস, সঞ্জয় রায়, হরেকৃষ্ণ সামন্ত. মিঠু মাইতি।

২৪-পরগণা : সৌমিত্র মজুমদার. প্রতিমা ভট্টাচার্যা, সুপ্রিয় পুরকায়স্থ, উত্তম কুণ্ডু, সমীরণ বিশ্বাস, সুকান্ত ঘোষ, চম্পক চক্রবর্তী, আশীষ বটব্যাল. তপনকুমার ঘোষ, সুগত দত্ত, বিভাস রায়. সৌম্য ভট্টাচার্যা, তাপস সরকার, বিমান রায়, তমাল ঘটক, সুব্রত চক্রবর্তী. উৎপল বিশ্বাস, স্মৃতিকণা কর. দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য

হাওড়া : চন্দন চট্টোপাধ্যায়, জোজো সাউ, মানস রায়-চৌধুরী, অমিতাভ শীল, সুজয় সিন্হা, সৌমেন পাল, সৌমেন্দু বিকাশ পাত্র, গৌতমকুমার পাত্তা. অভিজিৎ রায়, কাঞ্চন কাঞ্জিলাল, তীর্থঙ্কর পাইন, অভিজিৎ সরকার, দীপঙ্কর ভৌমিক, বিপ্রদাস চ্যাটার্জী, সুষেন গোয়া, অরূপ মাজি, দিলীপ দে, চঞ্চল ভট্টাচার্য্য।

হুগলী : নীলমনি দাস, অমরজিৎ রায়, শান্তনু চক্রবর্তী, অভিজিৎ রায়, শেখ আবুল ফজল. সঞ্চিতা সাহাচৌধুরী. শুভাশীষ ঘোষ, নন্দিনী দত্ত, সৌরভ সরকার, জ্যোতিপ্রকাশ চক্রবর্তী, সুনীতা ব্যানার্জী, শান্তনু চ্যাটার্জী, চন্দন চক্রবর্তী. দেবাশীষ চক্রবর্তী, সুতপা ব্যানার্জী. মহাশ্বেতা মুখার্জী, সুভাষ ব্যানার্জী, জয়দীপ ব্যানার্জী, অমিতাভ, চ্যাটার্জী. বিদ্যুৎকুমার ধোলে, কিংশুক মিত্র, অমিতাব্রত রায়, সুমিত সিন্হা, নেপাল চন্দ্র মাল, বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী, নির্মাল্য মোদক, বিশ্বনাথ খাঁ, শুভ্রা চন্দ্র, নীলেশচন্দ্র ঘোষ, চয়নিকা সান্যাল, শঙ্করী প্রসাদ মিশ্র।

বর্ধমান : তরুণকুমার সিংহ, গদাধর খাণ্ডেলওয়াল. রিমা বিশ্বাস, রাজকুমার সেন, মৃত্যুঞ্জয় পাল, তাপস সরকার, চৈতালী সরকার, পিয়ালী সরকার, আসফাক আলি. কাজরী দাশগুপ্ত তপন দাস, অরূপ দত্ত, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জিতকুমার নিয়োগী, সীমাদ্রি দাস, সোমা দাশ, তারাপদ কর্মকার, ফাল্গুনী দাস, দেবতনু ভট্টাচার্য্য. অম্লান পাল, সোমেশ ব্যানার্জী, সব্যসাচী রায়, মধুমিতা রায়।

মেদিনীপুর : সৈকতকুমার বসু, বিশ্বরঞ্জন বেরা, ব্রততী মুখার্জী. মৌসুমী দত্ত, সর্বানী ষড়ঙ্গী. দীপককুমার ষড়ঙ্গী, শমীকরঞ্জন সামন্ত, তুষার পাল, দেবেন বিশ্বাস, বিকাশ বিশ্বাস, অমিয় বিশ্বাস, জহরলাল বারিক, পঞ্চানন সাহু, রঞ্জনকুমার পানী. সুদীপকুমার জানা, শ্যামসেন্দু ভৌমিক, প্রশান্ত ত্রিপাঠি, অনিমেশ সামন্ত, সংগীতা পণ্ডা, অমিতাভ সোম, মিলনকুমার গুহ. তপনকুমার অধিকারী।

নদীয়া : তপনকুমার চক্রবর্তী, মানস কুণ্ডু. নির্মল কুমার দেবনাথ, দেবাশীষ কুণ্ডু, পারমিতা রায়, যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্যামল বিশ্বাস. দেবীকা ব্যানার্জী, কল্লোল চট্টোপাধ্যায়, চৈতালী রায়, দেবাশীষ রায়।

মুর্শিদাবাদ : দেবাশীষ বিশ্বাস, পলাশ মোহান্ত, বিবেকানন্দ সরকার, বিকাশ মোহান্ত, মানস মোহান্ত, অরুণকুমার দে, সঞ্জীব সরকার।

মালদহ : মাণিক পাল. দেবাশীষ শেঠ. কেয়া চৌধুরী তরুণকান্তি বিশ্বাস, উত্তমকুমার ঘোষ. মৃন্ময় পাল, স্বপন কর্মকার. প্রবল মিত্র, চিন্ময় পাল, তারাশঙ্কর সিন্হা, সুভাষ সেনগুপ্ত, সরিৎকুমার দাস, দেবাশিস শাসমল।

পশ্চিমদিনাজপুর : কৌশিক চৌধুরী, সৈকত চৌধুরী, শ্রীজ্ঞান মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় সাহা, অরিন্দম সাহা।

কোচবিহার : জয়ন্ত বোস, দেবযানী বোস, পম্পাশ্রী বোস, শম্পা মুখার্জী।

জলপাইগুড়ি : চিন্ময় মজুমদার।

দার্জিলিঙ : শিবেশ সরকার, জ্যোতিষ সরকার।

বীরভূম : শাশ্বতী চ্যাটার্জী, রমেন গুহ, অনিমেশ চ্যাটার্জী, ভবানীপ্রসাদ দত্ত, পবিত্র সিংহ, উমাশঙ্কর রায়।

বাঁকুড়া : দিলীপকুমার ঘোষ, অমিতাভ নাগ, সোমা সিংহ, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, সৌমেন মণ্ডল, রমেন মণ্ডল, কাজল মণ্ডল, রঞ্জিত মণ্ডল, বনজা মণ্ডল, সুজয় সামন্ত, সুমন সাম, সুনন্দা সাম, শান্তি সোম।

পুরুলিয়া : শৈবাল সরকার।

আসাম : ডিব্রুগড় : রমেন ভৌমিক, অনুপ দেব, তপনকুমার বড়ুয়া. রাহুল গুপ্ত, রজত দাস, দেবব্রত দস্তিদার, প্রদীপ কর্মকার, প্রদীপ পাইক, পবিত্র পাল, শমীক গঙ্গোপাধ্যায়, ডালিমকুমার দে, বাবলু কর্মকার,।

বিহার : ধানবাদ : রমা দরিপা, অভীক দরিপা।

গত সংখ্যার শব্দকূট সমাধান

১এ	ন	২জা	ই	৩ম
ডি	■	র	■	পে
৪স	৫লি	ন	৬এ	ড
■	টা	■	ট	■
৭ক্ষা	র	■	৮ম	স

(গত সংখ্যার বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার উত্তর):

১। রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকার জন্যে।

২। 32 টি দাঁত থাকে।

৩। ভিটামিন A, B, E এবং K স্নেহ-দ্রবণীয়।

৪। সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুতে।

৫। বীট, পেঁয়াজ, রসুন, ফুলকপি প্রভৃতি সব্জীতে আয়োডিন থাকে।

৬। বিজ্ঞানী টমসন।

৭। 'সিনাবার (HgS) পারদের একটি আকরিক।

৮। 2 গ্রাম হাইড্রোজেন।

৯। 6.02×10^{23} সংখ্যক অণু থাকে।

১০। অ্যামমিটার।

১১। $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$.

১২। অ্যাসিটিলিন।

১৩। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ছিলেন।

১৪। অ্যালবুমিন।

১৫। ফরাসী দেশের বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

১৬। বসন্ত, হাম, ডেঙ্গু, পোলিও ইত্যাদি ভাইরাস ঘটিত হয়।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

● অমরনাথ রায়

১। তামা কি চৌম্বক পদার্থ?

২। পরমাণুবাদের আবিষ্কর্তা কে?

৩। 'লাইনোটাইপ' এর আবিষ্কর্তা কে?

৪। বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস কোন্ কোন্ মৌল আবিষ্কার করেন?

৫। 'লুনার কাস্টিক' কি জিনিস?

৬। পরমাণুর নিউক্লিয়াস হতে কোন্ রশ্মি নির্গমের ফলে নিউক্লিয়নস্ এর প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে না?

৭। 1 নিউটন = কত ডাইন?

৮। ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ক'টি প্রোটন থাকে?

৯। কোন্ বিম্ব পর্দায় ফেলা যায় না?

১০। কঠিন অবস্থায় নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোন্‌টি তড়িতের সুপরিবাহী?
(ক) কর্পূর, (খ) সোডিয়াম ক্লোরাইড, (গ) হীরক, (ঘ) গ্রাফাইট।

১১। ভিটামিন A-র অপর নাম কি?

১২। 66 মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ঘণ্টায় 54 কিলোমিটার বেগে চলতে থাকলে 99 মিটার দীর্ঘ একটি প্ল্যাটফরম অতিক্রম করতে তার কতো সময় লাগবে?

১৩। তিনটি সংখ্যার গড় 7। প্রথম দুটি সংখ্যার গড় 4 হলে, তৃতীয় সংখ্যাটি কতো?

১৪। 'মেইজ' (Maize) ফুল, ফল না বীজ?

১৫। R রোধযুক্ত একটি তারকে সমানভাবে প্রসারিত করার ফলে তারটি দৈর্ঘ্যে বেড়ে দ্বিগুণ হলো। এক্ষেত্রে প্রসারিত তারটির রোধ কতো হবে?

১৬। মানুষের শরীরে অ্যাপেনডিক্স এর কাজ কি?

এবার তোমরা উত্তর দেবার জন্য অনেকদিন সময় পাচ্ছ। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ১০ই অক্টোবর। পরবর্তী সংখ্যা অক্টোবর নভেম্বর যুগ্মসংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে ১লা নভেম্বর। আশাকরি সব কটি প্রশ্নের উত্তরই তোমরা সঠিক দিতে পারবে।

শব্দ সন্ধান

অনুরাধা রায়

ভিন গ্রহ থেকে এক অত্যন্ত উন্নতমানের কমপিউটার পাঠিয়েছে পৃথিবী গ্রহের খবরাখবর জানাবার জন্য। পৃথিবী তার অভিযানের ক্ষেত্র, তাই কমপিউটারটির চেহারা ঠিক মানুষের মত। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে এই যন্ত্রমানব অবতরণ করল। অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বেচারা যন্ত্রমানব বিধান সরণি ধরে দৌড়াতে লাগল। সুবিধের জন্যে মানুষের খোলসটা অদৃশ্য করে দিয়ে খালি যন্ত্রের কাঠামোটা নিয়েই সে ছুটতে থাকল।

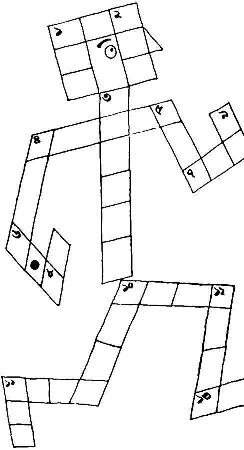

ওর এই যান্ত্রিক শরীর মহাকাশ ও মহাকাশ অভিযান সংক্রান্ত অনেক তথ্যের আধার। তোমরা সেই তথ্যগুলি বের করতে পারবে কি? নীচের সূত্র অনুযায়ী শব্দ দিয়ে যন্ত্রের খোপগুলি পূর্ণ কর, তাহলেই পারবে। তাড়াতাড়ি কর কিন্তু। ও এক্ষুনি হেদুয়ায় পৌঁছে যাবে, আর সেখান থেকে টেক্ অফ করবে মহাশূন্যের দিকে। আর কোনদিন পৃথিবীতে ফিরবে না। সূত্রানুযায়ী কখনো শূন্যস্থান পূর্ণ করে, কখনো এমনি শব্দগুলি বসাবে। সেখানে যুক্তাক্ষরের সম্ভাবনা সেখানে সুবিধেমত অক্ষর ভেঙে বা জুড়ে বসাবে।

শব্দ সন্ধানের সূত্র

পাশাপাশি :—

১। তিন তিনটে আংটি ঘিরে আছে শনিগ্রহকে। এদের নাম — — —

৪। বিস্ফোরিত অত্যুজ্জ্বল তারকা

৭। আধুনিক ——তৈরীতে ড. আর. এইচ. গডার্ডের অবদান প্রচুর

৮। আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা নক্ষত্রমণ্ডল সমূহের অন্যতম—(এটি পাশাপাশি না বলে নীচ থেকে ওপরে বলা যেতে পারে, তাই না?)

১০। অরোরা ———

১১। ইনি আবিষ্কার করেন যে গ্রহগুলির কক্ষপথ উপবৃত্তাকার এবং সূর্যের কাছে এলে তাদের গতি দ্রুততর হয়।

১২। হেলীস———১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে এডমাণ্ড হেলী এটিকে দেখে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেন।

উপর নীচে :—

১। সূর্যের একটি গ্রহ। আয়তনের দিক থেকে বৃহস্পতি ছাড়া এর আর জুড়ি নেই।

২। মহাকাশের একটি নক্ষত্রমণ্ডল

৩। আর এক নক্ষত্রমণ্ডল। গ্রীক পুরাণের মহাবীরের নাম বহন করছে।

৪। পৃথিবীর উপগ্রহ, নাকি কবিদের কল্পনালোক?

৫। ভারতের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ

৬। ইংরেজীতে ডাকে উরসা মাইনর বা লিট্‌ল বেয়ার বলে। আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে তার নাম লঘু সপ্তর্ষি, কেউ কেউ বলেন———

৯। সূর্যের ব্যাস——লক্ষ ছেষট্টি হাজার চারশ মাইল

১০। কক্ষপথে যে অবস্থানে পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে দূরে থাকে

১১। কেপ —— আমেরিকার এক প্রধান রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র

১৩। প্রথম চন্দ্রাভিযানের অন্যতম নায়ক। ইনি অবশ্য চাঁদে অবতরণ করেন নি। (অক্ষরগুলি উল্টে বসাতে হবে)

বি এফ-১১৮, সল্টলেক সিটি, কলি ঃ-৬৭

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা
ধীরেন বল
অমন গোমড়ামুখে বসে আছিস যে?
!
অভিমান বুঝি?
চুপ কর! সবসময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না!
ওরে বাবা! এযে আগ্নেয়গিরি!
আগ্নেয়গিরি কী দাদা? একটু বুঝিয়ে দে না!
আগ্নেয়গিরি ঠিক তোর মতন
আবার ইয়ার্কি?
একটা পাহাড়, তোর মতোই শান্তশিষ্ট, হঠাৎ একেবারে বার্স্ট আউট—বিস্ফোরণ
তাতে কী হলো?
পুড়ে হলো ছাই পম্পিয়াই।
বিসুভিয়াসের মাথা উড়ে গেল, বেরিয়ে এলো গলিত লাভাস্রোত। পম্পিয়াই সহর ঝামা।
লাভা কোথায় ছিল?
পৃথিবীটা ত ওই দিয়েই তৈরী। ওপরে ঠাণ্ডা সর পড়েছে, ভেতরটা— টগবগ্ টগ্ বগ্!
আমার ভেতরটা কিন্তু ঠাণ্ডা!

আমরা এখন জলের উপর উঠব প্রফেসর।
ডিং-ডিং
গৌতম কর্মকার
নটিলাস জলের উপর ভেসে উঠতেই সিঁড়ি বেয়ে দুজনে উঠে এলেন। দূরত্ব-মাপক যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের উচ্চতা নির্ণয় করলেন ক্যাপটেন।
এখন সময় বেলা বারোটা।
খানিক পরে দুজনে আবার নেমে এলেন। নটিলাস ডুব দিল গভীরে।
নটিলাস এখন ছুটে চলেছে একটি মহাসাগরীয় স্রোতের অনুকূলে। বঙ্গোপসাগর থেকে উদ্ভূত এই স্রোতটি মালাক্কার উপকূলভাগ পার হয়ে শেষ হয়েছে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে।
নিমোর অন্তর্ধানের পর নেড এবং কনসীল উপস্থিত হল প্রফেসরের কক্ষে।
এই জাহাজে লোকসংখ্যা কত তা কি জানেন প্রফেসর?
না নেড, তা ছাড়া এই মুহূর্তে নটিলাসকে আক্রমণ করা বা পালানর চিন্তা করা ঠিক নয়। এই ডুবোজাহাজটি আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার একটি উন্নত রূপ। এখানে না পেলে এমন একটি অপূর্ব জিনিষ থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম।
একি!
আমরা কি কুইবেকের মিউজিয়ামে?
আশ্চর্য! অপূর্ব!!
কক্ষটির আলো হঠাৎ নিভে গেল। চোখের সামনে ঘড় ঘড় শব্দ করতে করতে একটা লোহার চাদর সরে গেল। উদ্ভাসিত হল আলোকিত সমুদ্রের বিপুল জলরাশি। চাপ-প্রতিরোধক কাচের ভিতর দিয়ে সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখে তিনজনেরই দেহে বয়ে গেল রোমাঞ্চের শিহরণ।

R/ No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 2nd year • September 1982 Regd No WBCC/50

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

বেরোচ্ছে পুজোর অনেক আগেই

শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

যে বই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়বেই

তিনটি দুর্দ্ধর্ষ বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপন্যাস লিখবেন

অদ্রীশ বর্ধন ॥ সমরজিৎ কর
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

দুটি অসাধারণ সায়ান্স ফ্যাণ্টাসী লিখবেন

লীলা মজুমদার ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী

১৫টি বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান কাহিনী লিখবেন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অনীশ দেব, সিদ্ধার্থ ঘোষ, নিরঞ্জন সিংহ, সুব্রত সেনগুপ্ত কিন্নর রায়, বিমলেন্দু মিত্র, সঙ্কর্ষণ রায়, শিশির মজুমদার, বৃন্দাবন বাগচী, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু পাত্র, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর অনেকে

৩টি আন্তর্জাতিকখ্যাত রচনার অনুবাদ করবেন

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডী সেনগুপ্ত
এবং সৌরেন ভট্টাচার্য

মাধ্যমিকের প্রথম স্থানাধিকারীর বক্তব্য

মনোজের পড়াশোনা, জীবনচরিত ও আত্মচরিত

চারটি রঙীন সুদীর্ঘ চিত্রকাহিনী

ছবি এঁকেছেন : ধীরেন বল, শৈল চক্রবর্তী সমীর মণ্ডল, দেবাশিস দেব, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দেবদত্ত দেব, গৌতম কর্মকার, দিলীপ দাস, উজ্জ্বল ধর প্রমুখ শিল্পীরা।

পুজো সংখ্যার সংগে এক প্যাকেট ফ্রী

ম্যাজিক কার্ড

জগদীশচন্দ্র বসুর অপ্রকাশিত রচনা
ঘনাদাকে নিয়ে লিখবেন প্রেমেন্দ্র মিত্র
কলকাতার অজানা বিষয়ে লিখবেন শ্রীপান্থ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত বিষয়ে তিরিশটি প্রবন্ধ ॥ বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের ছড়া ॥ ধাঁধা ॥ বিজ্ঞানের ভেলকি লিখেছেন :

অরুণ চক্রবর্তী ॥ শ্রীকুমার রায় ॥ অনাদি দাঁ বিমান বসু ॥ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ ॥ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা জয়ন্ত বসু ॥ প্রসাদকুমার দাস ॥ সমীর ঘোষ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র ॥ পার্থ চট্টোপাধ্যায় দিবাকর সেন ॥ মৃণ্ময়ী দাস ॥ অমর নাথ রায় সুজিৎ সেনগুপ্ত ॥ সুনীত রায় ॥ রমাতোষ সরকার বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ শুভব্রত রায়চৌধুরী শক্তিপদ সরকার ॥ অরুণ বাগচি ॥ অজয় হোম অজেয় রায় ॥ বলরাম মজুমদার ॥ পৃথা বল সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ॥ অজিত চৌধুরী ॥ সুনীল সরকার ॥ জগদীশ ভট্টাচার্য ॥ তারকমোহন দাস অলক চক্রবর্তী ॥ অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ অমিতাভ চৌধুরী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু ॥ কৃষ্ণ ধর সুশীল গুপ্ত ॥ রঞ্জন ভাদুড়ী ॥ রেবন্ত গোস্বামী অনিল কর্মকার ॥ সুবীর সেন ॥ অবনী সাহা দাউদ হায়দার ॥ আনন্দ বাগচী ॥ কবিতা সিংহ সুজয় সোম ॥ অলক সেন ॥ রথীন সরকার যুগলকান্তি রায় ॥ প্রসিত রায়চৌধুরী ॥ অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ রবীনবন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নন্দলাল মাইতি অসীম মুখোপাধ্যায় ॥ এ. সি. সরকার ॥ অসিত চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রচ্ছদমুদ্রণ : রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২